প্রত্যেক সচেতন মুসলমানের বইটি পড়া উচিত

ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত

এক ব্রিটিশ গোয়েন্দার ডায়রি

অনুবাদক

মোঃ এ আর খান

এ জে এ মোমেন

ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে

নিয়োজিত

এক ব্রিটিশ গোয়েন্দার ডায়রি

অনুবাদক ঃ

মোঃ এ আর খান

এ জে এ মোমেন

জ্ঞানকোষ প্রকাশনী

৩৮/২,ক বাংলাবাজার

ঢাকা-১০০০

ফোন- ৭১১৮৪৪৩, ৮৬২৩২৫১, ৮১১২৪৪১

ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত এক ব্রিটিশ গোয়েন্দার ডায়রি

অনুবাদক ও লেখক ঃ মোঃ এ. আর. খান।
এ. জে. এ. মোমেন।

প্রকাশক ঃ শরীফ হাসান তরফদার
জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৮৪৪৩, ৮১১২৪৪১
E-mail: gyankoshprokashoni@gmail.com
gk_tarafder@yahoo.com

প্রথম প্রকাশকাল : ২১শে বইমেলা, ২০০৬ ইং।
দ্বিতীয় প্রকাশকাল : ২১ শে বইমেলা. ২০০৮ ইং ।
তৃতীয় প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১০ ইং।
চতুর্থ প্রকাশকাল : এপ্রিল, ২০১৪ ইং।
পুনঃ মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ইং।

প্রচ্ছদ ঃ মারুফ আহমেদ।

কম্পোজ ঃ নাবা ডট কম
মধ্য পাইকপাড়া, মিরপুর,
ঢাকা-১২১৬।

মুদ্রণ ঃ নোভা প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস্
১৫/ বি, মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন ঃ ৯৬৬৭৯১৯

মূল্য : ১০০.০০ টাকা মাত্র।

উৎসর্গ,

আঁধার ঘেরা পৃথিবী ঘোর অমানিশা চারিধার,

মুসলিম ভূখন্ডে,

তবু নকীব ফিরিছে যারা নতুন এক সুবহ্ সাদেকের প্রতিক্ষায়।।

অনুবাদকদ্বয়ের অনুভূতি থেকে -

এ বইটি ব্রিটিশ কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয় থেকে নিয়োজিত হ্যামফার নামক এক গোয়েন্দার ডায়রির অনুবাদ। হ্যামফারের ডায়রিটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানদের হাতে আসে এবং তারা জার্মান পত্রিকা 'ইসপিগল'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। তখন থেকেই বিষয়টি জনসমক্ষে চলে আসে।

প্রিয় নবী মুহাম্মদ(সঃ) মদিনাতে ইসলামি খিলাফত রাস্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা ১৯২৪ সনের ৩ মার্চ প্রায় সারে তেরশত বছর টিকে ছিল। সর্বশেষ খিলাফতের রাজধানী ছিল তুরস্কে। শেষের দিকে ইসলাম থেকে দুরে সরে যাওয়ার ফলে মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চৎপদতা শুরু হয়। খিলাফতের শাসন আমলে ১৭ শতকের গোড়ার দিকের কিছূ ঘটনা এ ডায়রির প্রতিপাদ্য বিষয়। পবিত্র কুরআনুল করিম-এর সূরা-আল মাঈদা'র ৫১ আয়াতে আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেন যে, "ইহুদী এবং মুসরেকরা কখনো তোমাদের বন্ধু হতে পারে না।" প্রথম থেকেই তারা ইসলামকে মুছে ফেলার জন্য পরিকল্পিতভাবে কাজ করে আসছে, এ বইটি তার একটি উদাহরণ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে সম্পদ লুন্ঠন করে করে ধনী হওয়াই ব্রিটিশদের রাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তি। ইসলামের ন্যায়পরায়নতা ব্রিটিশদের দস্যুবৃত্তা এবং মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে বাঁধা হয়ে দাড়াঁয়। তারা ইসলামকে মুছে ফেলার জন্য নানা ফন্দি-ফিকির খুঁজতে থাকে এবং এ লক্ষ্যে তারা লন্ডনে কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয় তৈরি করে। তারা এ মন্ত্রণালয় থেকে হাজার হাজার গোয়েন্দা বিভিন্ন মুসলিম দেশে পাঠায়, মিশনারী প্রতিষ্ঠা করে এবং সর্বশেষে সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। হ্যামফার হচ্ছে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয়ের একজন গোয়েন্দা। তাকে মিসর, ইরান, ইরাক, হিজাজ এবং ইসলামের খেলাফতের কেন্দ্র ইস্তাম্বুলে মুসলমানদেকে পথভ্রষ্ট করা এবং খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করার জন্য নিয়োজিত করে। সে নাজাদের মোহাম্মদ নামক এক মুসলিম যুবক'কে ফাঁদে ফেলে এবং কয়েক বছর তাকে ভ্রান্ত পথে চালিত করে, তারই ফলশ্রুতিতে তারা ১১২৫ হিজরীতে (১৭১৩ খ্রিস্টাব্দ) একটি নতুন ধর্মীয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ১১৫০ হিজরীতে তারা ওহাবিয়া সম্প্রদায়ের কথা ঘোষণা করে।

আজও ইহুদী খ্রিস্টানরা মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। মুসলমানদের দূর্বল করার জন্য বিভিন্ন দলে বা গ্রুপে বিভক্ত করতে চেষ্টা করছে। তারা ইরাকে মুসলমানদের ভূমি দখল করার ছাড়াও শিয়া সুন্নি বিভেদ উস্কে দিচ্ছে। আমাদের দেশে কাদিয়ানী নামে আর একটি সম্প্রদায় দাড় করানোর জন্য মদদ দিয়ে যাচ্ছে।

আমরা এ বইটি অনুবাদ করেছি এ কারণে যে, মুসলমানদের কিভাবে পতন শুরু হয়েছিল সে বিষয়টি যেন তারা স্পষ্ট বুঝতে পারে এবং শত্রুদের চিনতে পারেন, তাহলে তাদের পুনঃজাগরণের সঠিক পথ খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। আজও ইসলামের শত্রুরা কিভাবে কাজ করছে তাও তারা বুঝতে পারবেন।
তুরস্কের HAKIKAT KITABEVI প্রকাশনী মূল ডায়রির সাথে প্রয়োজনীয় টীকা এবং ক্ষেত্র বিশেষে কিছু সংযোজনীসহ বই আকারে প্রকাশ করে। আমরা সে বইটির ইংরেজি ভার্সন থেকে কেবলমাত্র ডায়রির অংশটি (কিছু টিকাসহ) অনুবাদ করেছি। বইটি আরো কিছু তথ্যে সমৃদ্ধ। ইংরেজি বইটি http://www.hakikatkitabevi.com ওয়েব সাইটে Confessions of a British Spy নামে পাওয়া যাবে।

বইটির দ্বিতীয় অংশে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ তুলে দেয়া হল। আশা করি পাঠকের ভাল লাগবে।

ইসলামকে আমাদের জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে তৌফিক দান করুন। আমিন ।

অনুবাদকদ্বয় –
মোঃ এ. আর. খান।
এ.জে.আব্দুল মোমেন।

সূচি পত্র

প্রথম অংশ

দ্বিতীয় অংশ

(কতিপয় নির্বাচিত প্রবন্ধ)

Publisher's Note:

Those who wish to print this book in its original form or to translate it into another language are permitted to do so. We pray that Allâhu ta'âlâ will bless them for this beneficial deed of theirs, and we thank them very much. However, permission is granted with the condition that the paper used in printing will be of a good quality and that the design of the text and setting will be properly and neatly done without mistakes. We would appreciate a copy of the book printed.

WAQF IKHLÂS

HAKIKAT KITABEVI
Darussefaka Cad. No: 57/A P.K. 35 34262
Tel: 90.212.523 4556 – 532 5843 Fax: 90.212.525 5979
http://www.hakikatkitabevi.com
e-mail: bilgi@hakikatkitabevi.com
Fatih-ISTANBUL/TURKEY 2001

প্রথম অংশ

প্রথম অনুচ্ছেদ

হ্যামফার বলেন ঃ

আমাদের ব্রিটেন এক বিশাল দেশ। এ দেশের সাগরের উপর সূর্য উদয় হয় এবং আবার এর সাগরের অতলে সূর্য অস্ত যায়। তারপরেও আমাদের কলোনী ভারত, চীন এবং মধ্যপ্রাচ্যে এখনও অনেক দুর্বল। এ রাষ্ট্রগুলো এখন পরিপূর্ণভাবে আমাদের করায়াত্ত নয়। এ দেশগুলোর ব্যাপারে আমরা স্বক্রিয় এবং ও সফল পরিকল্পনার গ্রহণ করেছি। আমরা অবিলম্বে এ সকল দেশগুলোতে সম্পূর্ন দখলদারী স্থাপন করতে পারব। এ জন্য আমাদের দুটি বিষয় অতিব জরুরী ঃ-

১। আমরা যে স্থান দখল করেছি তা ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

২। যে সকল স্থানে দখলদারিত্ব নাই তা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে।

কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয় উপরোক্ত প্রত্যেক কলোনী রাষ্ট্রের সমন্বয়ে এ কাজ দুটি করার জন্য কমশিন গঠন করেছে। আমি কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয়ে যোগদান করার সাথে সাথেই মন্ত্রীমহোদয় এ কাজের জন্য আমার উপর আস্থা স্থাপন করেন এবং আমাকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসক নিযুক্ত করেন। বাহ্যিকভাবে এটা ছিল একটা বাণিজ্যিক কোম্পানি কিন্তু এর প্রকৃত কাজ ছিল বিশাল ভারতের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পন্থা খুঁজে দেখা।

আমাদের সরকার ভারতের বিষয়ে ভীত ছিল না। ভারত হচ্ছে বহুজাতিক লোকের দেশ, এখানে মানুষেরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে এবং পরস্পরবিরোধী স্বার্থের লোক বাস করে। আমরা চীনের বিষয়েও ভীত নই। চীনে বৌদ্ধ ও কনফিউসিয়ান ধর্মের লোকেরা বাস করে, এর কোনটাই আমাদের জন্য বড় বাধা নয়। দুটো ধর্মই মৃতপ্রায় এবং জীবন ঘনিষ্ঠ নয় এবং কেবল কোন ধর্মাবলম্বী হিসেবে চিহ্নিত করা ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই। আর এ কারণেই এ দুই দেশের লোকদের দেশপ্রেমের অনুভূতি খুবই কম। এ দুটি দেশ আমাদের ব্রিটিশ সরকারের কোন

চিন্তার বিষয় নহে। কথা হচ্ছে, দেরিতে হলেও এ দুটি দেশ জয় করার কথা বিবেচনা থেকে বাদ দিলে চলবে না। তাই আমরা এ দুটি দেশে বেতন বা মজুরী নিয়ে সংঘাত, অজ্ঞতা, দারিদ্র্যতা ও রোগব্যাধি ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এক দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করি। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য এ দুটি দেশের প্রথা এবং নিয়ম-কানুন নকল ও অনুকরণ করতে শুরু করি।
অবশ্য ইসলামিক রাষ্ট্রসমূহের ব্যাপারে আমাদের ভয় ছিল। আমরা আমাদের স্বার্থের অনুকূলে সিকম্যান (অটোম্যান সম্রাট)-এর সাথে কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞ সদস্যদের অভিমত যে সিকম্যান এ শতাব্দীতেই শেষ হয়ে যাবে। অধিকন্তু আমরা ইরানী সরকারের সাথে আরো কিছু অতিরিক্ত গোপন চুক্তি সম্পাদন করেছি এবং এ দুটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানদের আমরা রাজমিস্ত্রির মতো বসিয়ে রেখেছি। এ দুটি জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়ার জন্য তাদের ঘুস প্রদান করে দুর্নীতিগ্রস্থ করা, অযোগ্য প্রশাসন তৈরি করা,. অপর্যাপ্ত ধর্মীয় শিক্ষা এবং সুন্দরী রমনিদের দ্বারা ব্যস্ত রেখে তাদের দায়িত্বে অবহেলা তৈরি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এত কিছু সত্ত্বেও আমরা আমাদের কর্মের আশানুরূপ ফল পাচ্ছিলাম না বলে উদবিগ্ন ছিলাম। ফল না পাওয়ার কারণ নিম্নে ব্যাখ্যা করছি।

১। মুসলমানরা একান্তভাবেই ধর্মভীরু। খুব বাড়িয়ে না বললেও বলা যায় যে প্রত্যেক মুসলমানই একজন পাদ্রীর বা সন্যাসীর মতো দৃঢ়ভাবে ইসলামের সাথে জড়িত। জানা যায় যে একজন পাদ্রীর বা সন্নাসী মৃত্যুবরণ করবে তবু খ্রিস্টান ধর্মকে ছেড়ে দিতে রাজী নয়। ইরানের শিয়া সম্প্রদায় খুবই সাংঘাতিক লোক। যারা শিয়া নয় তারা তাদেরকে কাফির এবং বাজেলোক মনে করে। শিয়াদের মতে খ্রিস্টানরা হচ্ছে অনিষ্টকারী কলূষিত ধরনের লোক। প্রকৃতপক্ষে একজন অপর জন থেকে নিজকে উত্তম হওয়ার জন্য চেষ্টা করে। এ বিষয়ে আমি একবার একজন শিয়াকে প্রশ্ন করেছিলাম যে কেন তোমরা একজন খ্রিস্টানকে এভাবে মনে কর? আমাকে এভাবে উত্তর দেয়া হয়েছিল; "ইসলামের নবী (সঃ) ছিলেন একজন অতীব জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি খ্রিস্টানদের আধ্যাত্মিক চাপে রাখতেন যেন তারা সঠিক পথ অনুসরণ করে আল্লাহর ধর্ম ইসলামকে গ্রহণ করতে পারে। সত্যিকার অর্থে, ইহা একটি রাষ্ট্রিয় নীতি যাতে

একজন লোক আনুগত্য না করা পর্যন্ত তাকে আধ্যাত্মিক চাপে রাখা হয়। আমি যে কলূষতার কথা বলেছি তা আসলে কোন বিষয় নয়। ইহা একটি আধ্যাত্মিক চাপ মাত্র। এটা যে কেবলমাত্র খ্রিস্টানদের জন্য ছিল তা নয়। এটা সুন্নী এবং অন্য সকল অবিশ্বাসীদের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছিল। এমনকি শিয়ারা ইরানের প্রাচীন মেজিয়্যানদের পূর্বপুরুষদেরও অপবিত্র মনে করে।"

তাকে আমি বললাম, "দেখ! সুন্নি এবং খ্রিস্টানরা এক আল্লায় বিশ্বাস করে, নবীত্বে এবং এবং শেষ বিচারের দিনেও বিশ্বাস করে, তবে কেন তারা অপবিত্র হবে"? সে উত্তরে বললো "তারা দুটি কারণে অপবিত্র। তারা আমাদের নবী (সঃ) কে অশ্রদ্ধা করেছে এবং তার কথাকে অসত্য বলেছে। তারা আমাদের নবীকে মিথ্যার অপবাদ দিয়েছে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং আল্লাহ আমাদের এহেন কর্ম থেকে রক্ষা করুন এবং আমরা তাদের এ ধরনের সাংঘাতিক মিথ্যাচারের জবাবে এভাবে ব্যাখ্যা অনুসরণ করি- যদি কেহ তোমাকে উৎপীড়ন করে , তুমি তাকে বিনিময়ে উৎপীড়ন কর, এবং তাদের বলো; "তোমরা কলূষিত"; **দ্বিতীয়তঃ** খ্রিস্টানরা আল্লাহর নবী সম্পর্কে অপকর্মের অভিযোগ করেছিল। উদাহরণসরূপ তারা বলে ঈসা (আঃ) (যিশু) মদ পান করতেন, সে কারণে তিনি অভিশপ্ত এবং ক্রুশবৃদ্ধ হয়েছিলেন।

এ সূত্র ধরে, আমি লোকটিকে বললাম যে খ্রিস্টানরা এরূপ কথা বলে নাই। সে বলল, "হ্যাঁ তা তারা বলে, তুমি জাননা, বাইবেলে এভাবে লেখা আছে"। "আমি শান্ত হয়ে যাই। তার কারণ হচ্ছে যদিও লোকটি দ্বিতীয় বিষয়টিতে সঠিক বলে নাই, তবে প্রথম বিষয়ে লোকটি ছিল সঠিক। যাইহোক, আমি এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করতে চাইনি। কারণ আমি যেভাবে ইসলামিক পোশাক পরে এসকল বিষয়ে বিতর্ক করছি তাতে তারা আমাকে সন্দেহ করে বসতে পারে। তাই আমি এ বিতর্ক পরিহার করি।

২। ইসলাম ছিল এক সময় ছিল কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার ধর্ম এবং মুসলমানরা ছিল সম্মানিত। এখন এ সম্মানিত জনগণকে একথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, যে তারা আজ দাসে পরিণত হয়েছে। তা নাহলে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে এমন মিথ্যাচার করাও সম্ভবপর হতো না এবং তাদের এমনভাবে বলা যেত না যে

একদা তোমরা যে সম্মান এবং শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলে তা ছিল কতগুলো অনুকূল পরিবেশের ফসল। সে দিনগুলো অতীত হয়ে গেছে এবং তা আর কখনও ফিরে আসবেনা।

৩। আমরা অতীব উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলাম যে অটোম্যানরা এবং ইরানীরা আমাদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পারবে এবং বানচাল করে দিবে। তা সত্ত্বেও, বাস্তবতা হচ্ছে এ দুটি রাষ্ট্র বিশেষভাবে দুর্বল হয়ে পরছে, তারপরও আমরা নিশ্চিন্ত নই কারণ তাদের সম্পদ, যুদ্ধাস্ত্র এবং কর্তৃত্বসহ একটি কেন্দ্রীয় সরকার এখনো বর্তমান আছে।

৪। আমরা ইসলামী মনীষীদের ব্যাপারে চরম দুঃচিন্তায় আছি। কারণ ইস্তাম্বুল, আল আজহার, ইরাকী এবং দামেস্কের পণ্ডিতরা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য হাসিলের পথে বড় বাধা। তারা জনগণের প্রতি দয়ালু, তাঁরা তাঁদের নীতি এবং আদর্শের সাথে সামান্যতম আপোষ করে না। কারণ তাঁরা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে তারা কুরআনুল করিমের প্রতিশ্রুত জান্নাতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে। জনগণও তাঁদেরকে অনুসরণ করছে। এমনকি সুলতানও তাঁদেরকে সমীহ করেন। সুন্নিরা শিয়াদেরমতো তাদের পণ্ডিতদের অন্ধভাবে অনুগত নয়। শিয়ারা বইপত্র পড়ে না, তারা শুধুমাত্র পণ্ডিতদের মান্য করে এবং তারা তাদের সুলতানের প্রতিও যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে না। অপরপক্ষে সুন্নিরা বই-পুস্তক পড়াশুনা করে এবং পন্ডিত ও সুলতানকে সম্মান করে।

এরপর আমরা অনেকগুলো সম্মেলন করেছি। আমরা ক্লান্ত হয়ে পরতাম এবং প্রতি বার হতাশ হয়ে দেখতাম যে আমাদের জন্য সকল রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমরা আমাদের গুপ্তচরদের নিকট থেকে যে তথ্য পেতাম তা ছিল হতাশাব্যাঞ্জক এবং সম্মেলনের ফলাফল হতো শূন্য। তবুও আমরা এ বিষয়ে আশা ত্যাগ করিনি। কারণ আমরা এমন এক শ্রেণীর লোক যারা, ধৈর্যের সাথে গাঢ় নিশ্বাস নেয়ার অভ্যাস রপ্ত করে ফেলেছি।

এক সম্মেলনে সর্বোচ্চ নির্দেশদাতা মন্ত্রী নিজেই এবং কয়েকজন বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন। আমরা ছিলাম বিশজন। আমাদের সম্মেলন তিন ঘণ্টা ধরে চলল এবং ফলপ্রসূ কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই চূড়ান্ত অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘটল। তথাপি একজন পাদ্রী বলল "চিন্তা করো না। ঈসা এবং তার অনুসারীরা তিনশত বছর নির্যাতিত হওয়ার পরে কর্তৃত্ব অর্জন করেছিল। এটা আশা করা যায় যে, অজানা বিশ্ব থেকে তিনি আমাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছেন এবং অবিশ্বাসীদের (তার মতে মুসলমান বুঝান হয়েছে), তাদের কেন্দ্র থেকে উৎখাত করার জন্য আমাদের সৌভাগ্য দান করবেন। হতে পারে তাতে তিনশত বছর দেরি। দীর্ঘ মেয়াদী ধৈর্য এবং দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আমরা আমাদেরকে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত করব। কর্তৃত্ব অর্জনের জন্য সম্ভাব্য সকল পদ্ধতি গ্রহণ করে আমরা সকল প্রকার গণমাধ্যমের প্রতিটি শাখা দখল করব। অবশ্যই আমরা মুসলমানদের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মকে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করব। আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এটা হবে সহায়ক, হতে পারে এর জন্য শতাব্দি বছর দরকার হবে। পিতার দায়িত্ব হচ্ছে তাদের সন্তানের জন্য কাজ করা।

একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো তাতে রাশিয়া, ফ্রান্স এবং এমনকি ইংল্যান্ড থেকে কূটনীতিক ও ধর্মীয় লোকজনেরা উপস্থিত ছিল। আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে আমিও ঐ সম্মেলনে যোগ দিতে পেরেছিলাম। তার কারণ মন্ত্রী সাহেবের সাথে আমার অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। সম্মেলনে মুসলমানদের বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত করা, তাদেরকে তাদের ধর্ম বিশ্বাস থেকে সরিয়ে ফেলা এবং স্পেনের মতো তাদেরকে খ্রিস্টান বানানোর পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। তথাপি সম্মেলনের উপসংহার যেরূপ আশা করা হয়েছে সেভাবে হয় নি। আমি সম্মেলনে আলোচ্য সকল বিষয় আমার "লা মালাকুত-ইল-মসিহ" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি।

মাটির গভীরে প্রথিত যে বৃক্ষের শিকর, তাকে হঠাৎ করে উপড়ে ফেলা কষ্টকর। কিন্তু এগুলো সহজ করা এবং অতিক্রমের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই ব্যাপক কষ্ট করতে হবে। খ্রিস্টধর্ম এখন সম্প্রসারিত হচ্ছে। আমাদের প্রভু ঈসা আমাদেরকে এরকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু খারাপ অবস্থা হচ্ছে যে পূর্ব এবং পশ্চিমের

সকলেই এক সময় মুহাম্মদকে সহায়তা করেছে। কিন্তু সে অবস্থা এখন আর নেই, উৎপাত (তারা ইসলামকে বুঝিয়েছে) দূর হয়েছে। আজকাল আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আমাদের মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য খ্রিস্টান সরকারগুলোর মহান কর্ম এবং চেষ্টার ফলে মুসলমানদের এখন পতন শুরু হয়েছে। অন্যদিকে খ্রিস্টানরা কর্তৃত্ব অর্জন করছে। শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে আমরা যে সকল রাষ্ট্রগুলোকে হাত ছাড়া করেছি তা পুনরুদ্ধার করার এটাই সময়। শক্তিশালী রাষ্ট্র গ্রেট ব্রিটেন এমন এক কাজের (ইসলামকে নির্মূল করতে) জন্য অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করছে।'

প্রথম অংশ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১১২২ হিজরী মোতাবেক ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে কমনওয়েলথ মন্ত্রী আমাকে একজন গোয়েন্দা হিসাবে মিসর, ইরাক, হেজাজ এবং ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে উপদল সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা। মন্ত্রণালয় সাহস ও উদ্যমের জন্য একই মিশনে এবং একই সময়ে কাজ করার জন্য আরও নয় জনকে নিয়োগ দেয়। আমাদেরকে প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা, তথ্য, ম্যাপ এবং রাষ্ট্র প্রধান, বুদ্ধিজীবী ও গোত্র প্রধানদের নামের একটি তালিকা দেয়া হয়। সচিবকে বিদায় জানানোর সময়কার একটি কথা আমি কখনও ভুলবনা। তিনি বললেন "আপনাদের সফলতার উপর আমাদের রাষ্ট্রের ভবিষৎ নির্ভর করছে। সুতরাং আপনারা আপনাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করবেন"।

আমি ইসলামিক খেলাফতের কেন্দ্র ইস্তাম্বুলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমার মূল দায়িত্ব ছাড়াও, আমি অতি দক্ষতার সাথে সেখানকার স্থানীয় মুসলমানদের মাতৃভাষা তুর্কি রপ্ত করলাম। আমি লন্ডনে থাকাকালীন তুর্কী, আরবী (আল কুরআনের ভাষা) এবং ইরানের পার্সি ভাষার অনেক কিছু শিখেছিলাম। তথাপি কোন ভাষা শিক্ষা করা আর মাতৃভাষায় মানুষেরা যেভাবে কথা বলে, এ দুয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে। কয়েক বছরে হয়তো প্রচলিত কৌশলগুলো শেখা যায় কিন্তু তার পরেও এ ব্যবধান কমিয়ে আনতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। যাতে জনগণ আমাকে সন্দেহ করতে না পারে সে জন্য আমি তুর্কি ভাষার খুঁটিনাটি সম্পর্কেও শিক্ষা গ্রহণ করলাম।

তারা আমাকে সন্দেহ করছে আমি এজন্য উদবিগ্ন ছিলাম না। কারণ মুসলমানেরা তাদের রাসূল মুহাম্মদ(সঃ)-এর নিকট থেকে ধৈর্যশীল, উন্মুক্ত হৃদয় এবং পরোপকারিতার শিক্ষালাভ করেছে। তারা আমাদের মতো সন্দেহপ্রবণ নয়। সর্বোপরি গোয়েন্দাদের গ্রেপ্তার করার জন্য তুর্কি সরকারের কোন সংস্থাও নেই।

এক ক্লান্তিকর ভ্রমণের পরে আমি ইস্তাম্বুল পৌছি। আমি বললাম আমার নাম "মোহাম্মদ" এবং আমি মুসলমানদের উপাসনালয় মসজিদে যেতে শুরু করি।

মুসলমানদের শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা এবং আনুগত্যের পদ্ধতি আমার পছন্দ হয়। মুহূর্তকাল পরেই আমি নিজেই নিজকে জিজ্ঞাসা করলাম- "কেন আমরা এ সকল নিরপরাধ মানুষদের সাথে শত্রুতা করছি"। আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট ইহাই কি আমাদের দীক্ষা দিয়েছিলেন? মুহূর্তেই আমি এ ধরনের চিন্তা থেকে সরে আসি, এবং আমার উপর অর্পিত দায়ীত্ব ভালভাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেই।

ইস্তাম্বুলে আমি আহম্মদ ইফেন্দি নামক এক বৃদ্ধ পন্ডিতের সাথে সাক্ষাৎ করি। তাঁর মতো এমন ঐতিহ্যময় ব্যবহার, উন্মুক্ত-হৃদয়, নির্মল আধ্যাতিকতার সমকক্ষ কোন ব্যক্তি আমি আমাদের ধর্মে কখনো দেখিনি। এ ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ(সঃ)-এর আদর্শে অনুসরণ করতে নিজকে দিবা-রাত্রি ব্যাপৃত রাখতেন। তাঁর মতে, মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন সঠিক এবং শ্রেষ্ঠ মানব। যখন তিনি তাঁর নাম উল্লেখ করেন, তাঁর চক্ষু অশ্রুশিক্ত হয়ে ওঠে। অবশ্যই আমি একজন অতি সৌভাগ্যবান কারণ আমি কে বা কোত্থেকে এসেছি তা তিনি জানতে চান নি। তিনি আমাকে "মোহাম্মদ ইফেন্দি" বলে ডাকতেন। তিনি কোমলতা ও সহানুভূতির সাথে আমার প্রশ্নের জবাব দিতেন এবং আচরণ করতেন। কারণ তিনি আমাকে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে কাজ করতে আসা এবং হযরত মুহাম্মদ(সঃ)-এর প্রতিনিধি খলিফার ছায়ায় বসবাসরত একজন মেহমান হিসেবে বিবেচনা করেন। তথাপি ইস্তাম্বুলে অবস্থান কালে আমি এরকম ছলচাতুরী ব্যবহার করেছিলাম।

একদিন আমি আহম্মদ ইফেন্দি'কে বললাম, "আমার পিতামাতা মারা গেছেন, আমার কোন ভাই বোন নাই এবং পৈত্রিক সূত্রে কোন সম্পত্তি ও নাই। আমি জীবিকা অর্জন এবং পবিত্র কুরআনুল করিম ও এবং সুন্নাত শিক্ষা লাভ করার জন্য ইসলামের কেন্দ্র ইস্তাম্বুলে এসেছি। যাতে আমার রোজগার ইহকাল এবং পরকাল উভয় জীবনের কাজে লাগে"। তিনি আমার এ কথা শুনে খুবই আনন্দিত হলেন এবং বললেন, "এ তিনটি কারণে তুমি সম্মানিত হবে।" তিনি যা বললে আমি নিচে তা হুবহু লিখছি।

১. তুমি একজন মুসলমান। সকল মুসলমান ভাই ভাই।
২. তুমি একজন অতিথি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন, "তোমরা মেহমানদের আন্তরিকতার সাথে অতিথেয়তা কর।
৩. তুমি কাজ করতে চাচ্ছ। হাদিস শরীফে আছে "যে ব্যাক্তি কাজ করে সে আল্লাহর প্রিয়।"

এ শব্দগুলো আমাকে অত্যন্ত প্রীত করেছিল। আমি নিজকে নিজে প্রশ্ন করলাম, "খ্রিষ্টান ধর্মে কি এরকম সুস্পষ্ট সত্য কিছু আছে? লজ্জাস্কর হলেও সত্য যে এগুলো একটিও নেই। আমাকে সবচেয়ে আশ্চার্য করেছে যে বিষয়টি তা হচ্ছে, ইসলাম এক মহৎ ধর্ম যা এমন সব অশিক্ষিত মহান লোকদের হাতে বিস্তৃত হয়েছে যারা জীবনে কি ঘটছে সে সম্পর্কে একেবারেই অসচেতন ছিল।

আমি আহাম্মদ ইফেন্দি'কে বললাম যে আমি পবিত্র কুরআনুল করিম শিখতে চাই। উত্তরে তিনি বললেন যে তিনি আমাকে অতি আনন্দের সাথে শেখাবেন এবং সূরা ফাতিহা শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। আমরা যা তেলাওয়াত করি তিনি তার ব্যাখ্যা করলেন। কিছূ কিছু শব্দ উচ্চারণে আমার মারাত্মক সমস্যা হতো। দুই বছর সময়ের মধ্যে আমি সমগ্র কুরআনুল করিম অধ্যায়ন শেষ করেছিলাম। প্রতিটি পাঠের আগে তিনি অযু করে নিতেন এবং আমাকেও অযু করতে নির্দেশ দিতেন। তিনি কিবলার দিকে মুখ করে বসতেন এবং পাঠদান শুরু করতেন। মুসলমানদের অযু হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে কিছু অংগ ধৌত করার পদ্ধতি।

১. মুখমন্ডল ধৌতকরণ।

২. ডান হাতের আঙ্গুল থেকে কনুই পর্যন্ত ধৌতকরা।

৩. বাম হাতের আঙ্গুল থেকে কনুই পর্যন্ত ধৌতকরা।

৪. মসেহ করা (হাতের সাথে লেগে থাকা পানি দ্বারা) উভয় হাত দ্বারা মাথা, কান এবং গলার পিছন দিকে ঘুড়িয়ে আনা।

৫. উভয় পা ধৌতকরা।

মেসওয়াক ব্যবহার করা ছিল আমার জন্য বিরক্তিকর। মেসওয়াক হচ্ছে একটি গাছের ডাল, যা দ্বারা মুসলমানরা তাদের মুখ ও দাঁত পরিষ্কার করে। আমার মনে হতো এ গাছের টুকরাটি মুখ এবং দাঁতের জন্য ক্ষতিকর। মাঝেমধ্যে তাতে আমার মুখে খোচা লাগতো এবং রক্ত বের হতো। তা সত্যেও আমি এটা ব্যবহার করতাম। তাঁদের মতে মেসওয়াক ব্যবহার করা হচ্ছে রাসূলুল্লাহর(সঃ) একটি মক্কি সুন্নাত। তাঁরা বলত এ ডালটি খুবই উপকারী। বস্তুতপক্ষে, আমার মুখের রক্ত পরা বন্ধ হয়েছিল এবং সে সময় আমার মুখে যে দুর্গন্ধ ছিল যা অধিকাংশ ব্রিটিশদের মুখেও হয় তাও দূর হয়েছিল।

ইস্তাম্বুলে আমি একটি কক্ষে রাত কাটাতাম। কক্ষটি মসজিদের খাদেমের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছিলাম। খাদেমের নাম ছিল মারওয়ান ইফেন্দি। মারওয়ান হযরত মুহাম্মদ(সঃ)-এর একজন সাহাবীর নাম। এ খাদেম কর্মচারীটি অত্যন্ত ভীতু প্রকৃতির মানুষ। সে তাঁর নাম নিয়ে অহংকার করতো এবং আমাকে বলত, ভবিষ্যতে আমার যদি কোন পুত্র সন্তান হয় তাহলে আমি যেন তার নাম মারওয়ান রাখি। তার কারণ মারওয়ান ইসলামের একজন বড় মাপের যোদ্ধা ছিলেন।

মারওয়ান ইফেন্দী সন্ধ্যা বেলায় তাঁর খাবার তৈরি করতো। আমি শুক্রবারে কাজে যেতাম না, শুক্রবার হচ্ছে মুসলমানদের ছুটির দিন। সপ্তাহের অন্যান্য কাজের দিন আমি খালিদ নামের এক কাঠমিস্ত্রির সঙ্গে কাজ করতাম এবং সপ্তাহ হিসেবে পারিশ্রমিক পেতাম। কারণ আমি সকাল থেকে দুপর পর্যন্ত খন্ডকালীন কাজ করতাম। সে শ্রমিকদের যে পরিমাণ পারিশ্রমিক দিত আমাকে তার অর্ধেক দিত। এ কাঠমিস্ত্রি তার অবসরের অধিকাংশ সময়ই খালিদ বিন ওয়ালিদের বিরত্ব গাঁথার কথা বলে সময় কাটাত। খালিদ বিন ওয়ালিদ ছিল হযরত মুহাম্মদ(সঃ)-এর একজন সাহাবি এবং তিনি তিনি বীর মুজাহিদ (ইসলামের এক বিখ্যাত যোদ্ধা) ছিলেন। তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিজয় অর্জন করেন। তা সত্ত্বেও উমর বিন খাত্তাবের খেলাফত কালে তাঁর (খালেদ বিন ওয়ালিদের) পদচ্যুতির কথা এখনো কাঠমিস্ত্রির হৃদয় ব্যাথিত করে তুলছিল ①।

খালিদ নামে যে কাঠমিস্ত্রির সাথে আমি কাজ করতাম সে ছিল অনৈতিক এবং চরম স্নায়ু বিকারগ্রস্থ মানুষ। সে যে কোন কারণেই হোক আমাকে খুব বিশ্বাস করতো। কেন বিশ্বাস করতো তা জানিনা, তবে খুব সম্ভবত, আমি সকল সময় তার বাধ্যগত ছিলাম, সেজন্য হতে পারে। সে গোপনে গোপনে শরীআতের বিধিবিধান অমান্য করতো। সে যখন তার বন্ধুদের সাথে থাকতো তখন সে শরীআতের বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য দেখাতো। সে শুক্রবার জুম্মার নামায পরতো, কিন্তু আমি তার অন্যান্য দৈনিক নামাযের ব্যাপারে নিশ্চিত নই।

আমি দোকানে নাস্তা করতাম। কাজ শেষে আমি আসরের নামায পড়তে মসজিদে যেতাম এবং সেখানে মাগরিবের নামায পর্যন্ত থাকতাম। মাগরিবের পর আমি আহম্মদ ইফেন্দির বাড়িতে যেতাম। যেখানে তিনি আমকে আরবী ও তুর্কি ভাষায় দুই ঘণ্টা করে পবিত্র কুরআনুল করিমের বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। তিনি আমাকে অতি উত্তমভাবে আল-কুরআন শিক্ষা দিতেন সেজন্য প্রতি শুক্রবার আমি আমার সাপ্তাহিক উপার্জিত অর্থ তার হাতে তুলে দিতাম। প্রকৃতপক্ষেই তিনি আমাকে অতি উত্তমভাবে কুরআনুল করিম তিলাওয়াত শিক্ষা দিতেন এবং আরবী এবং তুর্কি ভাষায় ইসলাম ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতেন।

আমি অবিবাহিত জানতে পেরে আহম্মদ ইফন্দী তাঁর কন্যাদের এক জনের সাথে আমার বিয়ে দিতে আগ্রহী হন। আমি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হইনি। কিন্তু তিনি আমাকে উৎসাহ দিয়ে বলতেন যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নবীর একটি সুন্নাত এবং নবী(সঃ) বলতেন, "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত পরিত্যাগ করল সে আমার নহে।" এ বিষয়টি আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটাতে পারে ধারণা করে আমি তাঁর নিকট মিথ্যা বললাম যে, আমার যৌন মিলন শক্তি কম। আর এ ভাবেই আমি আমাদের বন্ধুত্ব এবং সৎভাব বজায় রেখেছিলাম।

ইস্তাম্বুলে অবস্থানের মেয়াদ দুই বছর শেষ হলে আমি আহম্মদ ইফেন্দিকে বললাম যে, আমি দেশে ফিরে যেতে চাই। তিনি বললেন, "না, যেও না। কেন তুমি যাচ্ছ? তুমি যা কিছু চাও তা তুমি ইস্তাম্বুলেই পেতে পার। আল্লাহতায়ালার ধর্ম এবং দুনিয়াদারী এ দুইয়ের সকল কিছুই একত্রে একই সময়ে এ নগরীকে দিয়েছেন। তুমি বলেছ তোমার পিতা-মাতা মারা গেছেন এবং তোমার কোন ভাই-বোন নেই। তাহলে কেন তুমি ইস্তাম্বুলে স্থায়ী হচ্ছ না?" আহাম্মদ ইফেন্দি আমার সাহচর্যের উপর অভ্যাসগতভাবে নির্ভরশীল হয়ে পরছেন। আর এ জন্যেই তিনি আমার সান্নিধ্য ছাড়তে রাজি হচ্ছেন না। তাই তিনি ইস্তামবুলে স্থায়ী হওয়ার জন্য আমাকে উৎসাহিত করছেন। কিন্তু আমার দেশপ্রেম অনুভূতি আমাকে লন্ডনে ফিরে যেতে বাধ্য করছে, সেখানে খিলাফতের কেন্দ্র সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রদান করে আমাকে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

ইস্তাম্বুলে অবস্থানকালে আমার পর্যবেক্ষণ আমি মাসিক ভিত্তিতে কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয়ে পাঠাতাম। আমার মনে আছে যে একবার আমি এক রিপোর্টে জানতে চেয়েছিলাম যে, "যার সাথে কাজ করছি, তার সম্পর্কে কি করা যায়?" উত্তরে

আমাকে বলা হয়েছিল "তার সাথে পুং মৈথুন কর"। তার উত্তরটি ছিল এরকম যে "তোমার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হলে প্রয়োজনে তুমি যা কিছু করতে চাও কর।" আমি এ উত্তরে যথেষ্ট রুষ্ট হই এবং ঘৃণা প্রকাশ করি। আমার মনে হলো যে সমগ্র পৃথিবী আমার মাথার উপর ভেঙে পরেছে। আমি এরই মধ্যে জানতে পেরেছিলাম যে ইংল্যান্ডে এরকম ঘটনা অহরহ ঘটছে। আমার উর্ধ্বতন কর্মকতা আমাকে এ ধরনের কাজ করতে নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও আমার দ্বারা এটা কখনও ঘটেনি। আমি কি করতে পারি? সব টুকু ঔষধ প্রয়োগ করা ছাড়া আমার আর কোন বিকল্প নেই। আর তাই আমি সম্পূর্ণ শান্ত থেকে আমার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম।

আমি যখন আহাম্মদ ইফেন্দিকে বললাম "বিদায়", তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল এবং তিনি আমাকে বললেন, "পুত্র আমার, আল্লাহতায়ালা তোমার সহায় হোক এবং আবার যদি তুমি ইস্তাম্বুলে ফিরে এসে দেখ যে, আমি বেঁচে নেই, আমার কথা স্মরণ করো। আমার আত্মার জন্য সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করো। শেষ বিচারের দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে আমাদের আবার দেখা হবে"। আমিও খুব দুঃখ অনুভব করেছিলাম। তাই আমার চোখ থেকেও উষ্ম পানির ধারা নেমে আসছিল। যাই হোক, আমার দায়িত্ববোধ ছিল স্বভাবতই এসকল কিছুর চেয়েও আরো শক্তিশালী।

প্রথম অংশ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

আমার বন্ধুরা আগেই লন্ডনে পৌছে গিয়েছিল এবং তারা ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় থেকে নতুন দায়িত্বও গ্রহণ করছে। আমি ফিরে আসার পরে আমাকেও নতুন দায়িত্ব দেয়া হল। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের মধ্যে থেকে মাত্র ছয় জন ফিরে এসেছে।

অন্য চারজনের সম্পর্কে সচিব বললেন, "একজন ইসলাম গ্রহণ করে মিসরে অবস্থান করছে"। এরপরও সচিব খুশি ছিলেন কারণ, তিনি বললেন কারণ, "সে কোন গোপন তথ্য ফাঁস করে নাই।" দ্বিতীয় জন রাশিয়া চলে গেছে এবং সেখানে অবস্থান করছে। তিনি ছিলেন মূলত একজন রুশ নাগরিক। সচিব তার বিষয়ে খুবই চিন্তিত, সে তার জন্মভূমিতে ফিরে গেছে সে জন্য নয়, চিন্তার কারণ হচ্ছে সে সম্ভবত রাশিয়ার পক্ষ হয়ে কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে তার গুপ্তচরবৃত্তির মিশন সমাপ্ত করেছে। সচিব বললেন তৃতীয় জন বাগদাদের কাছে "ইমারা" শহরে প্লাগ রোগে মারা গেছে। মন্ত্রণালয় চতুর্থ জনকে সর্বশেষ ইয়েমেনের সানা নগরীতে সন্ধান পেয়েছিল এবং তারপর এক বছর পর্যন্ত তার থেকে রিপোর্ট পেয়েছে, তারপর রিপোর্ট আসা বন্ধ হয়ে যায়। সকল প্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। মন্ত্রণালয় এ চার জনের অর্ন্তধানকে আকস্মিক এক দূর্ঘটনা মনে করে। কারণ আমাদের লোকসংখ্যা সল্প হলেও জাতি এক মহা দায়িত্বে নিয়োজিত। আর তাই আমরা প্রতিটি মানুষকে সূক্ষ্মভাবে যাচাই করি।

আমার কয়েকটি রিপোর্টের পর, আমাদের চারজন প্রদত্ত রিপোর্টগুলো বাছাই করার জন্য সচিব এক সভা ডাকেন। আমার বন্ধুরা যখন তাদের কাজের বর্ণনা দিয়ে রিপোর্ট দাখিল করল, আমিও তখন আমার রিপোর্ট দাখিল করি। তারা আমার রিপোর্ট থেকে তথ্য টুকে নিল। মন্ত্রী, সচিব এবং সভায় অংশ গ্রহণকারীদের অনেকে আমার কাজের প্রশংসা করল। তারপরও আমি হলাম তৃতীয় উত্তম। আমার বন্ধু "জর্জ বেলকোড" প্রথম হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং হেনরী ফেন্স হয়েছে দ্বিতীয়।

আমি সন্দেহাতিতভাবে তূর্কি, আরবী, পবিত্র কুরআন এবং শরীআহ শিক্ষায় ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছিলাম। তথাপি আমার রিপোর্টে মন্ত্রণালয়ের কাছে অটোমান

সম্রাটের দূর্বল দিক তুলে ধরতে পারিনি। দু ঘণ্টা মিটিংয়ের পরে সচিব আমাকে আমার ব্যর্থতার কারণ জানতে চাইলেন। আমি বললাম "আমার প্রধান দায়িত্ব ছিল ভাষা, কুরআন এবং শরীআত সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করা। আমি এর বাইরে কোন কিছুতে সময় ব্যয় করি নাই। এবার যদি আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন তাহলে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারব।" সচিব বললেন, আমি অবশ্যই সফল হয়েছি কিন্তু তিনি কামনা করেছিলেন যাতে আমি প্রথম স্থান অধিকার করি। তিনি চলে যাওয়ার সময় বললেন "হে হ্যামফার, তোমার পরবর্তী মিশনের জন্য দুটি কাজ রয়েছে আর তা হচ্ছেঃ

১. মুসলমানদের দুর্বল জায়গাগুলো খুঁজে বের করতে হবে এবং ঐ পথে আমরা তাদের দেহে প্রবেশ করব এবং তাদের জোড়াগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দিব। মূলত শত্রুকে পরাজিত করার এটাই পথ।

২. যখন তুমি এসকল দূর্বল দিক চিহ্নিত করতে পারবে এবং আমি যা বলেছি তা করবে (অন্য কথায়, তুমি মুসলমানদের মধ্যে বিরোধের বীজ বপন করবে এবং একে অন্যের বিরুদ্ধে বিবাদে লিপ্ত করতে সক্ষম হবে) তখন তুমি হবে সব চেয়ে সফলকাম একজন গোয়েন্দা এবং মন্ত্রণালয় থেকে পদক অর্জনে তুমি সক্ষম হবে।"

আমি লন্ডনে ছয় মাস ছিলাম। আমি আমার চাচার প্রথম মেয়ে মারিয়া শ্যাভে'কে বিয়ে করি। সে সময় আমার বয়স ২২ বছর এবং তার বয়স ছিল ২৩। মারিয়া শ্যাভে ছিল এক অপরূপা সুন্দরী, গড়পড়তা বুদ্ধিমতি এবং সাধারণ কৃষ্টি জ্ঞান সম্পন্না। তার সাথে আমি আমার জীবনের সব চেয়ে সুখী এবং আনন্দমূখর দিনগুলো অতিবাহিত করি। আমার স্ত্রী ছিল গর্ভবতী। আমরা আমাদের নতুন অতিথির আগমনের অপেক্ষায় ছিলাম, তখন আমাকে ইরাক যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

আমি আমার পুত্রের জন্মের অপেক্ষায় ছিলাম, এ সময় ইরাক যাওয়ার নির্দেশ আমাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। যাইহোক, রাষ্ট্রের যে গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমি নিয়োজিত আছি এবং আমার সহকর্মীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যশ খ্যাতি অর্জনের জন্য আমি যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি, তা ছিল একজন স্বামী এবং একজন পিতার আবেগের অনেক উর্ধ্বে। আর তাই এ কাজটি আমি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করি। আমার স্ত্রীর ইচ্ছে ছিল বাচ্চা না হওয়ার পর্যন্ত যেন আমার যাত্রা স্থগিত রাখি। যে যা বলল

তাতে আমি কান দিলাম না। আমরা উভয়েই কাঁদছিলাম এবং পরস্পর বললাম "বিদায়"। আমার স্ত্রী বলল, "আমার কাছে চিঠি লিখা বন্ধ করো না, আমি আমার চিঠিতে তোমাকে আমাদের নতুন বাড়ীর কথা লিখব, যা সোনার চেয়েও দামী।" তার এ কথাগুলো আমার হৃদয়ে ঝড়ের মাতম বইয়ে দিল। আমি প্রায় আমার যাত্রা বাতিল করেই ফেলছিলাম। কিন্তু আমি আমার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হই। আমার স্ত্রীর নিকট বিদায়ের ক্ষণ প্রলম্বিত করে আমি আমার পরবর্তী চূড়ান্ত নির্দেশনামা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্যে বের হলাম।

ছয় মাস পর আমি ইরাকের বসরা নগরীতে যাই। নগরীর জনগণ আংশিক সুন্নি এবং আংশিক শিয়া। বসরা হচ্ছে আরব, পারশ্য এবং স্বল্প সংখ্যক খ্রিস্টান জনগণ অধ্যুষিত মিশ্রিত একটি উপ-জাতীয় শহর। আমার জীবনে আমি এ দিনই প্রথম পার্শিয়ানদের সাথে মিলিত হলাম। এভাবেই শিয়াবাদ এবং সুন্নিবাদের সংস্পর্শে এলাম।

শিয়ারা বলে যে তারা আলী বিন আবু তালেব'কে অনুসরণ করেন। তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ(সঃ)-এর কন্যা ফাতিমার স্বামী। এবং একই সাথে মুহাম্মদ(সঃ)-এর আপন চাচাত ভাই। তাঁরা বলেন যে, মুহাম্মদ(সঃ) আলীকেসহ বার জন ইমাম নিয়োগ করেছিলেন। আলীর উত্তারাধিকারীরা তাকে খলিফা হিসাবে পেতে চেয়েছিলেন।

আমার মতে (হ্যামফারের) খেলাফতের উত্তারাধিকারের ব্যাপারে আলী, হাসান, এবং হোসাইন-এর বিষয়ে শিয়াদের বক্তব্য সঠিক। ইসলামের ইতিহাস থেকে আমি যত দুর জেনেছি সম্মানিত এবং উচ্চ শিক্ষিত হযরত আলী খিলাফাতের জন্য উপযুক্ত ছিলেন। আমার এও মনে হয় না যে মুহাম্মদ(সঃ) হাসান এবং হোসাইনকে খলিফা পদে মনোনীত করেছিলেন। এ ব্যাপারেও আমাকে সন্দিহান করে তোলে যে, মুহাম্মদ (সঃ) হুসাইনের পুত্র এবং তার আট নাতিকে খলিফা হিসাবে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। মুহাম্মদ (সঃ)-এর তিরোধানের সময় তখন হোসেন ছিল নেহায়েত একজন শিশু, তাহলে তিনি কিভাবে জানতেন যে তাঁর আটটি নাতি হবে। যদি মুহাম্মদ(সঃ) একজন প্রকৃত রাসূল হয়ে থাকেন, তাহলে ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল, যেভাবে যীশুখ্রিস্ট ভবিষ্যত বিষয়ে জানতেন। যদিও মুহাম্মদ(সঃ)-এ নবুয়তের বিষয়টি আমাদের খ্রিস্টানদের কাছে সন্দেহ রয়েছে।

মুসলমানেরা বলে "মুহাম্মদ(সঃ) যে আল্লাহর নবী তার অগণিত প্রমাণ রয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে কুরআন।" আমি কুরআন পাঠ করেছি। ইহা একটি অতি উচ্চমানের গ্রন্থ। এমনকি ইহা তৌরাত এবং বাইবেল অপেক্ষাও অধিক উচ্চমানের। কারণ ইহাতে নীতিমালা, বিধি-বিধান এবং নৈতিকতা ইত্যাদি রয়েছে।

ইহা আমার কাছে অবাক করার মতো বিষয় যে মুহাম্মদ(সঃ)-এর মতো একজন অক্ষর জ্ঞানহীন ব্যক্তি কিভাবে এহেন উচ্চ মানের গ্রন্থকে ধারণ করেছিলেন এবং কোন অবস্থায় তিনি এর প্রত্যেকটি নৈতিকতা, বিচক্ষণতা এবং ব্যক্তিত্বকে শিক্ষার মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন, যা কোন অবস্থাতেই একজন সাধারণ মানুষের জীবনে অধ্যয়ন করে কিংবা দীর্ঘ ভ্রমণ করে পরিস্ফুটন করা সম্ভব নয়। আমি চিন্তা করি এ সকল বিষয়ই যদি মুহাম্মদ(সঃ)-এর নবুয়তের প্রমাণ হয়ে থাকে?

আমি সকল সময় মুহাম্মদ(সঃ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির সত্যতা প্রমাণের জন্য পর্যবেক্ষণে এবং গবেষণায় থাকতাম। একবার লন্ডনের এক পাদ্রীকে আমি আমার আগ্রহের কথা বললাম। ধর্মান্ধ এবং একগুয়ে তার উত্তর আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হলো না। আমি তুরস্কে থাকাকালে আহাম্মদ ইফেন্দিকে বহুবার এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। এমনকি তাঁর কাছ থেকেও কোন সন্তোষজনক উত্তর পাই নাই। সত্য কথা বলতে কি, আমি আহম্মদ ইফেন্দিকে এ বিষয়ে সরাসরি প্রশ্ন করা এড়িয়ে যেতাম, কারণ পাছে না আবার আমায় গোয়েন্দাগিরীর ব্যাপারে সন্দেহ করতে পারে।

আমি মুহাম্মদ(সঃ) সম্পর্কে খুব চিন্তা করতাম। তিনি যে আল্লাহর একজন রাসুল তাতে কোন সন্দেহ নাই এ সম্পর্কে আমরা বইয়ে অধ্যয়ন করেছি। তথাপি একজন খ্রিস্টান হিসাবে আমি তাঁর নবুয়তে বিশ্বাসী নই। তবে নিঃসন্দেহে তিনি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে শীর্ষে ছিলেন।

অপরপক্ষে সুন্নিরা বলত, "নবীর তিরোধানের পর মুসলমানেরা আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলীকে খেলাফতের জন্য যথা উপযুক্ত বিবেচনা করেন।" এ ধরনের বিতর্ক সকল ধর্মে আছে, তবে খ্রিস্টান ধর্মে অনেক বেশি আছে। আজ ওমর এবং আলী কেউ বেঁচে নাই, তারপরেও এ ধরণের বিতর্ক জিইয়ে রাখার কোন সন্তোষজনক উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। আমার মতে, মুসলমানেরা বুদ্ধিমান হলে তাদের অতি পুরানো দিনগুলোর পরিবর্তে বর্তমান নিয়ে ভাবা উচিত। একদিন

কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয়ে আমি শিয়া এবং সুন্নিদের মতভেদের কথা উল্লেখ করে বললাম যে, "মুসলমানেরা যদি তাদের জীবন সম্পর্কে বুঝতে পারে, তবে তারা অবশ্যই এ শিয়া সুন্নিদের মধ্যে মতপার্থক্য মিটিয়ে ফেলবে এবং একতাবদ্ধ হবে।" কোন একজন আমাকে বাধা দিয়ে এবং আপত্তিসহ বলল যে "তোমার দায়িত্ব হচ্ছে এ মত পার্থক্যকে উস্কে দেয়া, মুসলমানরা কিভাবে একতাবদ্ধ হবে তা চিন্তা করা নয়।"

আমার ইরাক যাত্রার প্রাক্কালে, সচিব বললেন. ও হ্যামফার, হাবিল এবং কাবিলকে ঈশ্বর সৃষ্টি করার পর থেকেই প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মধ্যে মতভেদ চলে আসছে। যীশু খ্রিস্ট ফিরে না আসা পর্যন্ত এ মতভেদ চলতে থাকবে। আর তাই বর্ণ, গোত্র, ভূখন্ডগত, জাতিগত এবং ধর্মীয় মতবিরোধগুলো থাকবেই।

এবার তোমার দায়িত্ব হচ্ছে এ মতবিরোধগুলোকে ভালভাবে শনাক্ত করা এবং মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট প্রদান করা। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদগুলোকে আরো উস্কে দেয়ার উপরই নির্ভর করছে তোমার অধিক সফলতা, আর সেটাই হবে ইংল্যান্ডের প্রতি তোমার মহান সেবা।

আমরা ইংরেজরা যাতে কল্যাণকর এবং বিলাসবহুল জীবন-যাপন করতে পারি তার জন্য আমাদের কলোনী রাষ্ট্রগুলোতে অনিষ্টকর কাজ এবং মতবিরোধ সৃষ্টি করে থাকি। শুধুমাত্র এরকম কাজের দ্বারাই আমরা অটোম্যান সাম্রাজ্যে ধ্বংশ করতে সমর্থ হব। অন্যথায়, কি করে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠির একটি জাতি বৃহৎ গোষ্টির একটি জাতিকে অধীনস্ত করতে পারে। তোমার সর্ব শক্তি দিয়ে গভীর ফাটলগুলো খোঁজ কর এবং পাওয়ার সাথে সাথেই ভিতরে প্রবেশ কর। তোমার জানা উচিত অটোম্যান এবং ইরানী সম্রাটরা তাদের অস্তিত্বের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছে। আর তাই তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে প্রশাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলা। ইতিহাসে দেখা যায় যে, সকল বিপ্লবের উৎস মূলে রয়েছে গণ-বিদ্রোহ। যখন মুসলমানদের ঐক্য ভেঙ্গে যাবে এবং তাদের মধ্য থেকে সাধারণ অনুভূতি উধাও হয়ে যাবে, তখন তাদের শক্তি ফুরিয়ে যাবে এবং এ ভাবেই আমরা সহজে তাদের ধ্বংস করতে সক্ষম হব।

প্রথম অংশ

চতূর্থ অনুচ্ছেদ

বসরায় পৌছে আমি একটি মসজিদে থাকার ব্যবস্থা করি। মসজিদের ইমাম ছিলেন একজন সুন্নি। সে মূল আরবের অধিবাসী, নাম তার শেখ ওমর তাঈ। পরিচয়ের পর থেকেই আমি তার সাথে গল্প-সল্প করতে শুরু করি। তথাপি সে শুরু থেকেই আমাকে সন্দেহ করতে থাকে এবং আমাকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকে। আমি এ বিপদজনক অবস্থার হাত থেকে রক্ষা পেতে নিজকে এ ভাবে পরিচয় দিতে থাকি: "আমি তূর্কিস্তানের উগদির অঞ্চলের মানুষ। আমি ইস্তাম্বুলের আহাম্মদ ইফেন্দির ছাত্র ছিলাম। আমি একজন কাঠ মিস্ত্রি হিসেবে খালিদ নামের একজনের সাথে কাজ করতাম।" যা যা আমি তুরস্ক অবস্থানকালে শিখেছিলাম সে সম্পর্কে তাকে কিছু তথ্য দিলাম। আমি তুর্কি ভাষায় কিছু বাক্যও বললাম। ইমাম সাহেব সেখানকার একজনকে চোখের ইশারা দিলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি সঠিক ভাবে তূর্কি ভাষা উচ্চারণ করেছি কি না। সঠিক উত্তর এলো। ইমাম সাহেব আস্বস্ত হলেন। আমি অত্যন্ত খুশী হলাম। যদিও আমার ধারণা ভুল ছিল। এর কিছুদিনের মধ্যেই আমার আশা ভঙ্গ হল। কারণ, লক্ষ্য করলাম যে, ইমাম সাহেব আমাকে একজন তুর্কি গোয়েন্দা হিসেবে সন্দেহ করতে শুরু করছেন। এর কিছু দিন পরেই ইমাম এবং সুলতানের (অটোম্যান) নিয়োকৃত গভর্নরের মধ্যে কিছু মতোবিরোধ এবং শত্রুতা লক্ষ্য করছিলাম।

শেখ উমর তাঈ মসজিদ থেকে চলে আসার পর আমি বিদেশী এবং পর্যটকদের হোটেলের একটি কক্ষ ভাড়া লই এবং সেখানে উঠি। হোটেলের মালিক ছিল একটি মূর্খ নাম তার মুরশিদ ইফেন্দি। প্রতিদিন সকালে সে আমাকে বিরক্ত করতো। ফজরের আজান হয়েছে বলে সে আমাকে তারাতারি জেগে উঠার জন্য দরজায় জোড়ে জোড়ে শব্দ করতো। আমি তাকে অনুসরণ করে জেগে উঠতাম এবং ফজরের নামায আদায় করতাম। তখন সে বলতো "তুমি ফজরের নামাযের পর সকালে কুরআন তেলাওয়াত করবে।" তাকে আমি বললাম "কুরআন তেলাওয়াত করা তো ফরয নয়, তাহলে আপনি কেন আমাকে এত উৎসাহিত করছেন"। সে উত্তর দিল "দিনের এ বেলায় অধিক নিদ্রা গেলে দারিদ্র্যতা আসে এবং যা হোটেল এবং হোটেলবাসীর জন্য দূর্ভাগ্যজনক"। তার এ নির্দেশ আমি

মেনে চলতে বাধ্য হলাম। অন্যথায় সে হয়তো আমকে হোটেল থেকে বের করে দিবে। তাই আজান দেয়ার সাথে সাথেই আমি উঠে ফজরের নামায আদায় করি এবং নামাযান্তে এক ঘন্টা করে পবিত্র কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করি।

একদিন মূরর্শিদ ইফেন্দি আমার কাছে এসে বললো, "তুমি এ কক্ষটি ভাড়া নেয়ার পর থেকেই দূর্ভাগ্যে আমার পিছু নিয়েছে। আমি মনে করি, তোমার কারণে এ অমঙ্গলের সূচনা হয়েছে। কেননা তুমি অবিবাহিত। অবিবাহিত থাকাই অমঙ্গলের চিহ্ন বহন করে। তুমি হয় বিয়ে কর, নয় হোটেল ত্যাগ কর"। আমি তাকে বললাম যে, বিয়ে করার মতো যথেষ্ট সম্পদ আমার নাই। আহাম্মদ ইফেন্দিকে আগে যা বলেছিলাম মূরর্শিদ ইফেন্দি আমি তা বলিনি। কারণ মূরশিদ ইফেন্দি এমন ধরনের মানুষ যে সে আমাকে উলঙ্গ করে আমার পৌরষ্যত্ব পরীক্ষা করে ছাড়বে, যে আমি যা বলেছি তা সত্য কিনা।

যখন আমি এ রূপ বললাম, মূর্শিদ ইফেন্দি আমাকে যাচাই করে বললো, তোমার বিশ্বাস এত দুর্বল কেন! তুমি কি আল্লাহর এ আয়াত পড় নাই, **"যদি তারা দরিদ্র হয় আল্লাহতা'লা তাদের নিজ দয়ায় ধনী করে দিবেন? ①"**

সে আমাকে বোকা বানিয়ে ফেলল। অবশেষে আমি বললাম, "ঠিক আছে, আমি বিয়ে করব। কিন্তু তুমি কি আমাকে প্রয়োজনীয় টাকা দিয়ে সহায়তা করবে? অথবা তুমি কি এমন কোন মেয়ের খোঁজ দিতে পার যাকে নিয়ে অল্প ব্যয়ে সংসার করা যাবে"?

এক পলক নিরীক্ষণ করার পর, মূর্শিদ ইফেন্দি বলল, "আমি এ সবের ধার ধারি না। হয় রজব মাসের শুরুতে বিয়ে কর, অথবা হোটেল ত্যাগ কর"। তখন রজব মাস শুরু হওয়ার আর মাত্র ২৫ দিন বাকী।

প্রাসঙ্গক্রমে আমি আরবী মাসের নাম উচ্চারণ করছি, মহর্‌রম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউল আখির, জিমাদিয়া-উল-আউয়াল, জিমাদিউল আখির, রজব, শাবান, রমাদান, শাওয়াল, জিলক্বাদ, জিলহাজ্ব। মাসগুলোর কোনটিতে ৩০ দিনের বেশি নহে, অথবা ২৯ দিনের কম নহে। এগুলো চাঁদের হিসেব অনুযায়ী গণনা করা হয়।

কাঠমিস্ত্রীর সহকারী হিসাবে একটি চাকরি নিয়ে আমি মুর্শিদ ইফেন্দির হোটেল ত্যাগ করি। আমি সল্প বেতনে এক চুক্তিতে রাজী হই, কিন্তু আমার থাকা খাওয়ার খরচ চাকরিদাতা বহন করবেন। আমি রজব মাসের আগেই আমার চাকরিদাতা

①সূরা নুর, আয়াত-৩২।

মালিক কাঠমিস্ত্রীর দোকানে চলে আসি। কাঠমিস্ত্রীই মূলত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান ব্যক্তি। তিনি আমাকে তার নিজের ছেলের মতো ব্যবহার করতেন। তিনি ছিলেন ইরানের খোরাসানের একজন শিয়া মুসলিম এবং তার নাম ছিল আবদ-উর-রিজা। তার সাথে থাকার সুবিধা নিয়ে, আমি ফার্সি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি। প্রত্যেক বৈকালে ইরানী শিয়ারা এখানে একত্রিত হয়ে রাজনীতি থেকে অর্থনীতি পর্যন্ত নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতো। প্রায়ই তারা তাদের সরকার এবং ইস্তাম্বুলে খলিফার দূর্বলতা নিয়ে আপত্তিকর কথা বলতো। কোন আগন্তুক উপস্থিত হলে তারা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ফেলতো এবং তাদের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করতো। তারা আমাকে খুব বিশ্বাস করতো। যাই হোক, পরে আমি বুঝতে পারলাম যে, আমি তুর্কি ভাষায় কথা বলায় তারা আমকে একজন আজারবাইজানী হিসেবে মনে করতো।

এক যুবক সময় অসময় আমাদের কাঠমিস্ত্রীর দোকানে আসতো। সে একজন ছাত্র, বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করে এবং সে আরবী, পার্শিয়ান এবং তুর্কি ভাষা বুঝতে পারে। তার নাম **মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নাজদী**। এ যুবকটি ছিল অত্যন্ত অমার্জিত এবং অত্যন্ত বিচলিত প্রকৃতির। অটোম্যান সরকারের বিরুদ্ধে বেশি বেশি কিছু কটূক্তি করা হলেও সে ইরানী সরকারের দোষ-ক্রটি সম্পর্কে কিছুই বলতো না।

এ একই মনোভাবের কারণে সে এবং দোকানের মালিক আবদ-উর-রিদা উভয়ে ছিল পরস্পর বন্ধুর মতো এবং উভয়েই ইস্তাম্বুলের খলিফার প্রতি ছিল শত্রু ভাবাপন্ন। কিন্তু এ সুন্নী যুবকের পক্ষে কি করে পার্শিয়ান ভাষা বুঝা এবং আবদ-উর-রিজার মতো একজন শিয়ার সাথে বন্ধুত্ব করা সম্ভব ছিল? শহরে সুন্নীরা শিয়াদের সাথে বন্ধুত্ব এবং ভ্রাতিত্বের ভান করতো। নগরীর অধিকাংশ নাগরিকরা আরবী ও পার্শিয়ান উভয় ভাষা বুঝতো এবং অধিকাংশ জনগণই তূর্কি ভাষাও অধিকতর ভাল বুঝতো।

নাজাদের মোহাম্মদ ছিল দৃশ্যতঃ একজন সুন্নি। সর্বোপরি অধিকাংশ সুন্নিরাই শিয়াদের সমালোচনা করতো। প্রকৃতপক্ষে, তারা বলতো যে শিয়ারা হচ্ছে অবিশ্বাসী, কিন্তু এ লোকটি কখনো শিয়াদের তিরস্কার করতো না। নাজাদের মোহাম্মদের মতে, সুন্নিদের চার মাজহাব থেকে যে কোন এক মাজহাব গ্রহণের কোন কারণ নাই। সে বলতো "আল্লাহর গ্রন্থে এ মাজহাব সম্পর্কে একটি স্বাক্ষ্য প্রমাণ নাই"। এ বিষয়ে সে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে আয়াতুল কারিমায় এবং সহি হাদিস শরীফ এড়িয়ে যেত।

চার মাজহাব হচ্ছে: হযরত মুহাম্মদ(সঃ)-এর তিরোধারনের এক শত বছর পর সুন্নি মুসলমানদের মধ্য থেকে চার জন মনীষীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। তারা হচ্ছেন: আবু হানিফা, আহাম্মদ বিন হামবল, মালিক বিন আনাছ এবং মোহাম্মদ বিন ইদ্রীছ সাফী। কোন কোন খলিফা সুন্নীদের চারজন পন্ডিতের মধ্য থেকে যে কোন এক জনকে অনুসরণ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতো। তারা বলতো এ চার পন্ডিত ছাড়া কেহই কুরানুল করিম এবং সুন্নতের ইর্জতিহাদ করতে পারবে না। এ ঘটনার ফলেই মুসলমানদের জ্ঞানের দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। ইর্জতিহাদের এ বিধিনিষেধকেই ইসলামের স্থবিরতার কারণ বলে মনে করা হয়।

শিয়ারা তাদের সম্প্রদায়ের কথা প্রচারের জন্য এ ভ্রান্ত তথ্যগুলোকে ব্যবহার করে। তখন শিয়ারা সংখ্যা ছিল সুন্নীদের দশ ভাগের চেয়েও কম। কিন্তু এখন তারা বৃদ্ধি পেয়ে সংখ্যায় সুন্নিদের সমান হয়েছে। এ ফলাফল হচ্ছে প্রকৃতিগত। ইসতিহাদ হচ্ছে একটি হাতিয়ারের মতো। ইহা ইসলামকে উন্নত করে এবং পবিত্র কুরআনুল করিম এবং হাদিসকে যুগ উপযোগি ভাবে সহজে বুঝতে সহায়তা করে। অন্যভাবে বলা যায় যে ইসতিহাদ বন্ধ করে দেয়ার মানে হচ্ছে এ হাতিয়ারকে একটি অকেজো হাতিয়ারে পরিণত করা। ইহা মাজহাবকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলবে। এ ভাবেই ইহা এক সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণের দরজাকে বন্ধ করে দিবে এবং সময়ের দাবীকে উপেক্ষা করবে। আপনার হাতিয়ার যদি অকার্যকর হয় এবং আপনার শত্রু যদি যোগ্যতাসম্পন্ন হয়, তাহলে আজ হোক বা কাল হোক আপনি শত্রুর হাতে পরাস্ত হবেনই। আমি মনে করি, বুদ্ধিমান সুন্নীদের মধ্যে কেহ ভবিষ্যতে ইজতিহাদের দরজা আবার উন্মোচন করবে। যদি তারা তা করতে সক্ষম না হয়, তবে কয়েক শতাব্দির মধ্যে তারা দূর্বল হবে এবং শিয়ারা শক্তিশালী হবে। [যাই হোক, চার মাজহাব এর ইমামরা প্রকৃতপক্ষে একই বিশ্বাস এবং একই ধর্মমত পোষণ করেন। তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। পার্থক্য শুধুমাত্র প্রার্থনার পদ্ধতি নিয়ে। এবং এ কারণেই মুসলমানরা পর্যায়ক্রমে সুবিধা গ্রহণ করতো। অন্যদিকে শিয়ারা বারটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এভাবে তারা দূর্বল ও নিস্ক্রীয় হয়ে পরে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত একটি বই হচ্ছে Milal Wa Nihal.]

নাজাদের এ উদ্ধত যুবক মোহাম্মদ কুরআন ও সুন্নার আলোকে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতো। সে সম্পূর্ণ রুপে পন্ডিতদের মতামতকে উপেক্ষা করতো। কেবলমাত্র তার সময়কার পন্ডিতদের বা চার মাজহাবের ইমামদের মতামতকেই নয় বরং উল্লেখযোগ্য সাহাবীদের যেমন আবু বকর এবং উমর-এর মতামতকেও উপেক্ষা করতো। কুরআনের আয়াত আলোচনার সময় যখনই সে এসকল

মনীষীদের মতামতের সাথে ভিন্ন মত বিশিষ্ট কুরআনের কোন আয়াত পেত, তখন সে বলতো, "নবী (সঃ) বলেছেন,- আমি, তোমদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ্ রেখে গেলাম"। তিনি কখনও বলেন নাই যে, "আমি তোমদের জন্য কুরাআন, সুন্নাহ্, সাহাবা এবং মাজহাবের ইমামদের রেখে গেলাম①"। ফলে মাজহাবের ইমামদের মতামত কিংবা সাহাবা বা পন্ডিতদের বিবরণী নিয়ে যতই বিতর্ক হোকনা কেন, তাই সরাসরি কুরআন এবং সুন্নাহ অনুসরণ করা ফরয ②"। আবদ-উর-রিদার ঘরে রাতের খাবারে আলোচনার পর নাজাদের মোহাম্মদ এবং কোম থেকে আগত অতিথি শিয়া পন্ডিত শেখ জাওয়াদের মধ্যে যে এ বিতর্কের সূত্রপাত হলো তা নিম্নরুপ।

শেখ জাওয়াদঃ তুমি যখন হযরত আলীকে একজন মুজতাহিদ মনে কর, তখন কেন তুমি তাঁকে শিয়াদেরমতো অনুসরণ করবে না?

নাজাদের মোহাম্মদঃ আলী, ওমর কিংবা অন্য সাহাবীদের থেকে কোন পার্থক্য নাই। তাঁহার বক্তব্য কোন প্রামাণ্য দালিলিক ছিল না। শুধুমাত্র কুরআন এবং সুন্নাহ'ই বিশ্বাসযোগ্য দলিল। (প্রকৃত সত্যতা হচ্ছে যে সাহাবাদের প্রদত্ত বিবৃতি প্রামাণ্য দলিলিক হওয়ার ক্ষমতা রাখে। কারণ আমাদের নবী (সঃ) তাদের যে কাউকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন ③।

---

① এখানে তিনি হাদীস শরিফের যে কথাটি অস্বিকার করেছেন তা হলো- মহানবী সাহাবীদেরকে অনুসরণ করতে বলেছেন।

② আজকাল সকল মুসলিম দেশে মূর্খ এবং নির্বোধ লোকেরা ধার্মিক লোকের ছদ্মবেশে আহলে সুন্নাহর মনীষীদের আক্রমণ করে থাকে। তারা সৌদি আরব থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করে বিনিময়ে ওহাবিজমের প্রচারণা করে। তারা সকলেই প্রতি ক্ষেত্রে নাজাদের মোহাম্মদের পূর্ব প্রদত্ত বক্তব্যকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে, আহলে সুন্নাহর কোন মনীষী বা চার মাজহাবের কোন ইমাম কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোন বক্তব্য প্রদান করেন নাই। তারা মূল উৎসের সাথে কোন কিছু সংযোজন করেন নাই, তারা কেবলমাত্র এগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ওহাবিরা ব্রিটিশদের সাজানো নমুনা অনুযায়ী মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য মিথ্যা উপস্থাপন করেছে।

③ যে মুসলমান মুহাম্মদ(সঃ)-এর সুন্দর ও পবিত্র মুখ দর্শন করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন সাহাবী। সাহাবীদের বহুবচনকে বলা হয় সাহাবা বা আস-হাব।

শেখ জাওয়াদঃ আমাদের রাসূল(সঃ) বলেছেন, "আমি হচ্ছি জ্ঞানের নগরী, এবং আলী হচ্ছে ইহার সদর দরজা," এখানে কি হযরত আলী এবং অন্য সাহাবাগণের মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয় নাই?

নাজাদের মোহাম্মদঃ আলীর দেয়া বিবৃতি যদি প্রামাণ্য দলিল হয়, তাহলে রাসূল(সঃ) কি বলতেন না যে, "আমি তোমাদের জন্য পবিত্র কুরআন, পবিত্র সুন্নাহ এবং আলীকে রেখে গেলাম?"

শেখ জাওয়াদ ঃ হ্যাঁ, আমরা গ্রহণ করতে পারি যা তিনি (রাসূল) এইরূপ বলেছেন। তিনি একটি হাদিস শরীফ থেকে শুরু করেন, "আমার পর আল্লাহর গ্রন্থ এবং আমার আহলই বায়াত রেখে গেলাম।" এবং আলী আহল-ই-বায়াত এর সবচেয়ে বড় সদস্য।

রাসূল(সঃ) যে এরূপ বলেছেন তা নাজাদের মোহাম্মদ অস্বীকার করলো। শেখ জাওয়াদ নাজাদের মোহাম্মদ'কে অস্বীকার করলো এবং প্রমাণ দ্বারা বুঝাতে চাইল। যাই হোক, নাজাদের মোহাম্মদ আপত্তি জানিয়ে বলল যে "তুমি নিশ্চিত করে বল যে, রাসূল বলিয়াছেন **'আমি তোমার কাছে আল্লাহর গ্রন্থ এবং আমার আহলে-ই-বায়াত রেখে গেলাম।'** তাহলে সে ক্ষেত্রে রাসূলের সুন্নাহর অবস্থান কোথায়?"

শেখ জাওয়াদঃ সুন্নাহ হচ্ছে আল্লাহর নবী কর্তৃক পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা। আল্লাহর নবী বলেন, "আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব এবং আমার আহলেই বায়াত রেখে যাচ্ছি"। "আল্লাহর কিতাব" এ শব্দগুলোর মধ্যে সুন্নাহ অন্তর্ভুক্ত আছে, যা আগে বলা হয়েছে।

নাজাদের মোহাম্মদ ঃ যেহেতু তোমার তথ্য অনুযায়ী আহালে বায়াত হচ্ছে পবিত্র কুরানের ব্যাখ্যা, তাহলে হাদীস দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যার প্রয়োজন কেন?

শেখ জাওয়াদ ঃ রাসুল (সঃ)-এর ওয়াফতের পর তাঁর উম্মতরা মনে করেছিল যে সময়ের দাবী পূরণ করার জন্য পবিত্র কুরআনের একটি ব্যাখ্যা থাকা উচিত। এর কারণ হচ্ছে রসূল(সঃ) উম্মতদেরকে কুরআন অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। এবং আহালেই বায়াতরা সময়ের দাবী পূরণের জন্য পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদান করবে।

আমি নিজে এ বিতর্ক বেশ উপভোগ করি। শেখ জাওয়াদ এর সামনে নাজাদের মোহাম্মদ ছিল শিকারীর হাতে এক নিশ্চল এক চড়ুই পাখীর মতো।

নাজাদের মোহাম্মদের মতো একজন লোককেই আমি খুঁজছিলাম। কারণ কালজয়ী মনীষীদের এমনকি (প্রাথমিক কালের) চার খলীফার প্রতি তার অবজ্ঞা এবং পবিত্র

কুরআন এবং সুন্নাহ সম্পর্কে তার নিজস্ব দৃষ্টিভংগি। এসব দিয়ে তাকে বাগে আনা এবং কব্জা করার জন্য অন্যতম পয়েন্ট বলে আমার মনে হয়েছিল। ইস্তাম্বুলে যে আহাম্মদ ইফেন্দি আমাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন তার চেয়ে ব্যতিক্রম ছিল এ দাম্ভিক যুবক। এ পন্ডিত ব্যক্তি তার পূর্বশুরীদের পর্বতপ্রমান স্মৃতি বহন করতেন। কোন শক্তি তাকে তার অবস্থান থেকে টলাতে সমর্থ হয় নাই। যখন তিনি আবু হানিফার নাম উল্লেখ করতেন, তখন তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং অযু করতেন; যখনি তিনি হাদিস গ্রন্থ বুখারী স্পর্শ করার কথা ভাবতেন, তখনি তিনি আবার অযু করতেন। সুন্নিরা এই গ্রন্থটি অত্যন্ত বিশ্বাস করে।

নাজাদের মোহাম্মদ অন্যদিকে আবু হানিফাকে অনেক বেশি অবজ্ঞা করেছে। সে বলত "আবু হানিফা যা বলেছেন তার চেয়ে আমি ভাল জানি(১)"। আরো বলত, তার মতে, বোখারী শরিফের অর্ধেকই সঠিক নয় (২)।

আমি যখন হ্যামফার এর স্বীকারোক্তি মূলক এই গ্রন্থ খানার তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করছিলাম, তখনকার কিছু ঘটনা আমার মনে আছে। আমি তখন হাই স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলাম।

পড়ানোর সময় আমার ছাত্রদের একজন আমাকে জিজ্ঞেস করল, "স্যার, একজন মুসলমান যদি যুদ্ধে মারা যায়, তবে সে কি একজন শহীদ হবে?", আমি বললাম, হ্যা সে শহীদ হবে। "নবী (সঃ) কি একথা বলেছেন"? "হ্যাঁ তিনি বলেছিলেন" আমি আবার জবাব দিলাম। "যদি কেউ সাগরে ডুবে মারা যায় তিনিও কি শহীদ হবেন?" আমার উত্তর ছিল "হ্যাঁ", এবং এ ক্ষেত্রে তিনি কি অধিক সওয়াবের অধিকারী হবেন। এরপর সে আবার জিজ্ঞেস করলো, "যদি কেউ বিমান থেকে পরে মারা যায় সে কি একজন শহীদ হবে"? আমি বললাম "হ্যাঁ, সেও"। "আমাদের রাসূল(সঃ) কি একথাও বলেছেন"? হ্যাঁ তিনি বলেছেন। ইহার পর সে বাতাসে সাফল্যের মৃদুহাস্য ধ্বনি দিয়ে বললো, "স্যার, সে সময় তো বিমান ছিল না?" তার প্রতি আমার উত্তর ছিল এইরূপঃ "পুত্র আমার! আমাদের রাসূলের(সঃ) নিরানব্বইটি নাম ছিল। প্রতিটি নামেরই রয়েছে সুন্দর অর্থ আছে এবং তিনি নিজেও এ গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তার একটি নাম হচ্ছে জামি-উল কলিম।

---

(১)বর্তমানে লা-মাজহাবী কিছু অজ্ঞ লোকও এরূপ বলে থাকে।

(২)কিছু লোকের এরূপ উক্তি প্রমাণ করে আসলে তাদের হাদীস সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই।

*তিনি একটি শব্দের দ্বারা শব্দের অনেক ঘঁনা বর্ননা করতেন। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি বলেছিলেন, "যদি কেউ উচ্চ এক স্থান থেকে পরে মারা যায় তবে তিনিও শহীদ হবেন"। ছেলেটি ভক্তিশ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার সাথে আমার এ উত্তরে সম্মত হল। একই অর্থে, পবিত্র কুরআনুল করিম এবং হাদিস শরীফে বহুশব্দ, নিয়ম-কানুন, নির্দেশনা, বিধি-নিষেধ আছে এ একই সাথে বিভিন্ন অর্থ বহন করে। কোন কাজ কর্মের ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করা এবং সঠিক ক্ষেত্রে সঠিক ভাবে প্রয়োগকে **ইজতিহাদ** বলা হয়। ইজতিহাদ করার জন্য যথাযথ জ্ঞান থাকা চাই। এ জন্যই সুন্নিরা সম্ভবত অজ্ঞ লোকদের জন্য ইজতেহাদ নিষিদ্ধ করেছে। এর দ্বারা ইজতিহাদ বন্ধ করা বুঝায় না। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পর থেকে কোন পন্ডিত শিক্ষায় এমন উচ্চ স্তরে উপনীত হতে পারে নাই যিনি একজন পরিপূর্ণভাবে মুজতাহিদের (যথেষ্ট জ্ঞানী যাতে যথাযথ ভাবে ইজতিহাদ করতে সক্ষম) পর্যায়ে পৌছতে পারে। ফলে কেহই ইজতিহাদ পালন করেন নাই ফলে স্বাভাবিক ভাবে মানুষ মনে করে যে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ ছিল। পৃথিবী শেষ দিকে, ঈসা (যিশু) আলাইহে সাল্লাম স্বর্গ থেকে অবতরণ করবেন এবং মেহেদী (যিনি একজন প্রত্যাশিত ইসলামিক যোদ্ধা এবং নায়ক) উপস্থিত হবেন, এ লোকেরা ইজতিহাদ পালন করবেন।*

আমাদের রাসূলুল্লাহ(সঃ) বলেছেন, "আমার পর মুসলমানেরা তিহাত্তরটি দলে বিভক্ত হবে। এ দলগুলোর মধ্যে মাত্র একটি দল বেহেস্তে প্রবেশ করবে"। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে ঐ দলে কে কে থাকবেন? তিনি তখন বললেন, "যারা আমাকে এবং আমার সাহাবাদেরকে তাদের জন্য গ্রহণ করবে"। অন্যদিকে হাদিস শরীফে তিনি বলেছেন "আমার সাহাবারা হচ্ছে মহাজগতের নক্ষত্রের মতো। তুমি তাদের যে কোন একজনকে অনুসরণ করে হেদায়েত লাভ করতে পারবে"। অন্য অর্থে তিনি বলেন, "তুমি এমন পথের সন্ধান পাবে যা তোমাকে জান্নাতে পৌছে দিবে"। ইয়েমেন-এর আবদুল্লাহ বিন সাবা নামক একজন ইয়াহুদি, মুসলিম সাহাবার বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করে। কিছু অজ্ঞ লোক যারা এ ইহুদিকে বিশ্বাস করেছিল এবং সাহাবাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করেছিল তারাই হচ্ছে শিয়া এবং যে সকল মানুষ যারা হাদিস শরীফ মান্য করেছে এবং সাহাবাদের ভালবেসে অনুসরণ করছে তাদেরকে সুন্নি বলা হয়।]

আমি নাজাদের মাহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব এর সঙ্গে এক মধুর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করি। আমি সর্বত্র তার প্রসংশার কথা প্রচার করতে থাকি। একদিন আমি তাকে বললাম, তুমি উমর এবং আলীর অপেক্ষাও মহৎ। রাসুল (সঃ) জীবিত

থাকলে তিনি তাদের পরিবর্তে তোমাকে খলিফা হিসেবে নিয়োগ দিতেন। আমি আশা করছি তোমার হাতে ইসলাম পুনঃসংঘটিত হবে এবং উন্নত হবে। তুমিই একমাত্র পন্ডিত ব্যক্তি যে ইসলামকে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে পারবে।

আবদুল ওহাবের পুত্র মোহাম্মদ এবং আমি উভয়ে পবিত্র কুরানের নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করতে স্থির করি। এ নতুন পরিকল্পনা ছিল শুধুমাত্র আমার উদ্দেশ্যকে বাস্তবে প্রতিফলিত করা এবং আমাদের ব্যাখ্যা হবে সাহাবা, মাজহাবের ইমাম এবং মুফাচ্ছির (কুরানের ব্যাখ্যা করতে যিনি বিশেষজ্ঞ) দ্বারা প্রদত্ত কুরআনের ব্যাখ্যার বিপরীত। আমরা কুরআন তিলাওয়াত করতাম এবং কোন আয়াতের বিষয়ে আলোচনা করতাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল নাজাদের মোহাম্মদকে ভূল পথে চালিত করা। সর্বোপরি সে নিজকে একজন সংস্কারক হিসেবে তুলে ধরতে চেষ্টা করছিল এবং সে সন্তুষ্টির সাথে আমার মতামত গ্রহণ করতো, কারণ আমি যেন তার প্রতি অধিক বিশ্বাসভাজন থাকি।

কোন এক উৎসবে আমি তাকে বললাম, "জেহাদ করা (ইসলামের স্বার্থে যুদ্ধ করা, ত্যাগ স্বীকার করা) ফরয নহে।"

সে প্রতিবাদ করলো, কেন ফরয হবেনা, এ আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে "যুদ্ধ কর অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে(১)?"

আমি বললাম, তাহলে রাসূলুল্লাহ(সঃ) কেন আল্লাহর আদেশ সত্ত্বেও মুনাফিকদের (আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারীদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি, আয়াতে আছে "জেহাদ ঘোষণা কর অবিশ্বাসিদের এবং মুনাফেকদের বিরুদ্ধে(২)?" অপরদিকে **Mawâhibu ladunniyya**-তে লেখা আছে যে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সাতাশটি জিহাদ পরিচালনা করা হয়েছিল। তাদের তরবারিগুলো ইস্তাম্বুলের যাদু ঘরে প্রর্দশনের জন্য রাখা হয়েছে। মুনাফিকরা মিথ্যা মুসলিম হবার ভান করে। সে সময় তারা রসূলুল্লাহ(সঃ) সাথে মসজিদ-ই-নববীতে নামায আদায় করত। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের সম্পর্কে জানতেন। তথাপি তিনি তাদের কাউকে বলেনি যে -"তুমি একজন মুনাফেক"। যদি তিনি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতেন এবং তাদের হত্যা করতেন। তাহলে জনগণ বলতো যে, যারা মুহাম্মদ(সঃ) কে বিশ্বাস করে তিনি তাদেরকেও হত্যা করছেন।

---

(১)সূরা তৌবা, আয়াত ৭৩।
(২)সূরা তৌবা, আয়াত ৭৩।

তাই তিনি তাদের বিরুদ্ধে মৌখিকভাবে জিহাদ ঘোষণা করেন। জিহাদ হচ্ছে ফরয, এক জন মানুষ তার জীবন, তার সম্পদ কিংবা তার বক্তব্যে দিয়ে জিহাদ করতে পারে। যে আয়াতে করিমায় অবিশ্বাশীদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেখানে কি ধরনের জিহাদ করতে হবে তার ধরন সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই।

অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধের মাধ্যমে জিহাদ করতে হবে এবং মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে ধর্মীয় প্রচারণা এবং উপদেশ দ্বারা। এ আয়াতে করিমা দ্বারা এহেন প্রকৃতির জেহাদের কথা বলা হয়েছে]।

তিনি বলেন- রাসূল তাদের বিরুদ্ধে বক্তেব্যের মাধ্যমে জেহাদ ঘোষণা করে ছিলেন।

আমি বললাম - যে জিহাদ ফরয করা হয়েছে তা কি একজনের বক্তব্যের দ্বারাই পালন করা সম্ভব?

তিনি বলেন - রাসূল (সঃ) অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ছিলেন।

আমি বললাম, "রাসূল (সঃ) নিজকে রক্ষার জন্য অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন কারণ অবিশ্বাসীরা তাঁকে হত্যা করতে মনস্থির করে ছিল"।

সে মাথা নোয়ালো।

অন্য এক সময় আমি তাকে বললাম মুতানিকা ① ইসলাম কর্তৃক বৈধ করা হয়েছে। সে আপত্তি করলো "না, তা করা হয় নাই।"

আমি বললাম - আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "তাদের ব্যবহারের বিনিময়ে তুমি তাদের জন্য নির্ধারিত মোহরানা পরিশোধ করবে ②।"

সে বললো - উমার তাঁর সময়ে মুতা বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন এরকম দুটি উদাহরণ আছে। "তিনি বলেছেন এটা যে করবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে"।

আমি বললাম -"তুমি দুই রকম কথা বলছ, তুমিই বলছ যে তুমি উমর অপেক্ষা উত্তম এবং তুমি নিজেই তাঁকে অনুসরণ করছ"।

---

①নিকাহ হচ্ছে ইসলাম অনুযায়ী বিবাহের চুক্তি। মুতানিকা হচ্ছে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা কোন একটি সময় পর্যন্ত একত্রে বসবাস করার একটি চুক্তি। এ বিবাহ প্রথার চুক্তি ইসলামে বৈধ নহে।

②সূরা নিছা, আয়াত-২৪।

অধিকন্তু উমর আরো বলেছিলেন যে রাসূলুল্লা (সঃ) এ বিষয়ে অনুমতি ছিল তা জানা সত্ত্বেও তিনি নিষিদ্ধ করেছেন ১। তাহলে কেন তুমি নবীর কথাকে বাদ দিচ্ছ এবং উমরের কথা মান্য করছ। দ

সে কোন উত্তর করল না। আমি বুঝলাম যে তাকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছি। আমার মনে হলো যে নাজাদের মোহাম্মদ এখন একজন নারীর সান্নিধ্য কামনা করছে। সে ছিল অবিবাহিত। আমি তাকে বললাম, "আস, আমরা প্রত্যেকে মুতানিকার মাধ্যমে একজন নারী গ্রহণ করি। আমরা তাদের সাথে ভাল সময় উপভোগ করব। সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। এটা ছিল আমার কাছে বড় সুযোগ, তাই তার উপভোগের জন্য আমি একজন মেয়ে খুঁজে বের করার প্রতিজ্ঞা করি। আমার উদ্দেশ্য ছিল তার লাজ-লজ্জা দূরিভূত করা। কিন্তু সে একটি শর্ত আরোপ করে বসল যে, এ বিষয়টি আমাদের মধ্যে গোপন রাখতে হবে এবং মহিলার কাছে তার নামও গোপন রাখতে হবে। আমি দ্রুত কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরণ করা খ্রিষ্টান মহিলাদের নিকট গেলাম। তাদেরকে মুসলিম যুবকদের অপরাধের পথে প্রলুব্ধ করার জন্য এখানে প্রেরণ করা হয়েছে। আমি সম্পূর্ণ বিষয়টি তাদের একজনের নিকট ব্যাখ্যা করলাম। সে সহায়তা দিতে রাজী হলো। আমি মহিলার ডাক নাম দিলাম সাফিয়া। আমি নাজাদের মোহাম্মদকে সাফিয়ার ঘরে নিয়ে গেলাম।

সুফিয়া তার ঘরে একা ছিল। আমরা নাজাদের মোহাম্মদের সাথে তার এক সপ্তাহের বিবাহের চুক্তি করি, সে সাফিয়াকে মোহরানা হিসেবে কিছু স্বর্ণালঙ্কার দিল। আর এ ভাবেই আমরা নাজাদের মোহাম্মদকে বিপথগামী করতে আরম্ভ করি, সাফিয়া ভিতর থেকে আর আমি বাইরে থেকে।

---

১ মুতানিকা বর্তমান কালের কুকর্মের সঙ্গে তুল্য। শিয়া সম্প্রদায়ের মতে এটি বৈধ ছিল। উমর(রাঃ) এরূপ বলেন নি। অন্যান্য খ্রিষ্টানদেরমতো এ ইংরেজ গোয়েন্দা হযরত উমারের বিরুদ্ধে উচ্চস্বরে বিরুদ্ধাচরণ করেছে যা তাঁর বিষয়ে একটি উপলক্ষ্য মাত্র। উজ্জাজ–ই–কাদিয়ান গ্রন্থটিতে লিখিত আছে- উমার(রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুতাকাহ নিষিদ্ধ করেছেন এবং আল্লাহর নবী যা নিষিদ্ধ করেছেন তা তিনি চলতে দিতে পারেন না। সকল সাহাবাকেরামগণ খলিফার এ তথ্যে সমর্থন দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আলীও ছিলেন।" অনুগ্রহ করে গ্রন্থটি দেখুন–(Document of The Right Word)।

নাজাদের মোহাম্মদ এখন সম্পূর্ণরূপে সাফিয়ার হাতের মুঠায়। সে এখন ইজতিহাদ ও আদর্শের বিপরীতে শরিআতের আদেশ অমান্য করার স্বাদ আস্বাদন করছে।

মুতানিকার তৃতীয় দিনে আমি মদ পান হারাম নয় এ নিয়ে এক দীর্ঘ বিতর্কে অবতীর্ণ হলাম। যদিও মদ পান করা হারাম তার পক্ষে সে বহু আয়াত এবং হাদিস উদ্বৃত করল। আমি সে সকল বাতিল করে দিয়ে পরিশেষে বললাম, ইহা সত্য যে ইয়াজিদ এবং উম্মাইয়া ও আব্বাসিয় খলিফারা অধিক মদ পান করতেন। তারা কি সকলেই খারাপ লোক ছিল আর তুমিই একমাত্র সঠিক পথের অনুসারী? তুমি যা জান তার চেয়ে তারা অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং সুন্না ভাল জানতো। তারা পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে মদ পান করা মাকরুহ, হারাম নয়। ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের বইয়েও মদ পান করা মুবাহ বলা হয়েছে। সকল ধর্মই হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশনামা। প্রকৃতপক্ষে, ব্যাখ্যাকারকের মতে, "হে ঈমানদার লোকেরা মদ, জুয়া ও এ আস্তানা ও পাশা এসব নাপাক শয়তানী কাজ, তোমরা তা পরিহার কর।"-এ আয়াত নাজিল হওয়ার আগ পর্যন্ত হযরত ওমর মদপান করতেন (১)। এটা যদি হারাম হতো তা হলে নবী তাঁকে সংশোধনের জন্য শাস্তি দিতেন। যেহেতু রাসূল (সঃ) তাঁকে শাস্তি দেননি, তাই হালাল । [*কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে যে, হযরত উমর (রাঃ) হারাম হওয়ার আগে মদ পান করতেন। নিষিদ্ধ হওয়ার পরে তিনি কখনো মদ পান করেন নি। কোন উমাইয়া এবং আব্বাসিয় খলিফা পান করে থাকলেও এটা প্রতীয়মান হয় না যে মদ পান করা মাকরুহ। এটা প্রামাণ হয় যে তারা হারাম কাজ করে অপরাধী হয়েছেন।*

গোয়েন্দা কর্তৃক উল্লেখ করা আয়াত ও অন্যান্য আয়াত এবং হাদিস শরীফ থেকে দেখা যায় যে মদ পান করা হারাম। Riyad-un-nasihin,-এ বর্নীত আছে যে আগে মদ পান করা বৈধ ছিল। হযরত উমর, সাদ ইবনে ওয়াক্কাছ, এবং কিছু সংক্ষক অন্যান্য সাহাবাগণ মদ পান করতেন। পরবর্তীতে সূরা বাকারার ২১৯তম আয়াতে মদ পান করাকে ভিষণ পাপ বলে ঘোসণা করা হয়েছে। কিছুদিন পর সূরা নিছার ৪৩তম আয়াত নাজিল হয় এবং এতে ঘোষনা করা হয় " মদপান অবস্থায় নামাযে যেওনা"। অবশেষে মাঈদা সূরার ৯৩তম আয়াতে মদ্য পান হারাম করা হয়। হাদিস শরিফেও নিম্নরুপ বর্ণিত হয়েছে। "যদি কোন কিছু বেশি পরিমান গ্রহণ করার ফলে নেশা হয়, তবে তা সামান্য পরিমাণ গ্রহণ করাও হারাম" এবং "মদ পান হচ্ছে সাংঘাতিক পাপ" এবং "যারা মদ পান করে তাদের সাথে বন্ধুত্ব

---

(১) *সূরা মাঈদা*, আয়াত ৯০।

করো না! তার জানাযায় অংশ নিও না! তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক করো না!" এবং "মদপান করা মূর্তীর উপাসনা করার শামিল" এবং "যে মদ পান করে, বিক্রয় করে, তৈরি করে, প্রদান করে তাকে আল্লাহতায়ালা অভিশাপ দেন" ।]

নাজাদের মোহাম্মদ বলেন কিছু বর্ণনা মতে "উমর পানির সাথে মিশিয়ে মদ পান করতেন এবং বলতেন নেশার তীব্রতা না থাকলে তা হারাম নয়। উমরের উদ্দেশ্য সঠিক, কারণ কুরআনে ঘোষিত হয়েছে "শয়তান চায় এ মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মাঝে একটি শক্রতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিতে এবং এভাবে তোমাদেরকে আল্লাহর জিকির ও নামায থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে, তোমরা কি এ কাজ থেকে ফিরে আসবে না১?"

এ আয়াত মতে মদের নেশার তীব্রতা না হলে তা গুণাহের কারণ হবে না। তাই নেশার প্রতিক্রিয়া না হলে তা পান করা হারাম নহে২।

আমি মদ পান সম্পর্কে এ বিতর্কের বিষয়টি সাফিয়াকে বললাম এবং নাজদের মোহাম্মদকে কড়া মদ পরিবেশন করার নির্দেশ দিলাম। পরে সে বলল, "তুমি যেভাবে বলেছ আমি সেভাবেই তাকে মদ পান করিয়েছি। সে আমার সাথে নৃত্য করেছে এবং রাত্রে বেশ কয়েকবার আমার সাথে মিলিত হয়েছে"। এরপর থেকে সাফিয়া এবং আমি পুরাপুরিভাবে নাজাদের মোহাম্মদকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসি। আমাদের বিদায় অনুষ্ঠানের ভাষণে কমনওয়েলথ মন্ত্রী আমাকে বলেছিল "আমরা মদ এবং নারীর সাহায্যে অবিশ্বাসিদের (তার মতে মুসলমান) নিকট থেকে স্পেন দখল করেছি। এ দুটি বৃহৎ শক্তি ব্যবহার করে আবার আমাদের ঐ সকল ভূখন্ড পূনরুদ্ধার করতে হবে"। তার কথা কতটা সত্য তা আমি এখন বুঝতে পারছি।

একদিন আমি নাজাদের মোহাম্মদের কাছে রোযার প্রসংগ উত্থাপন করলাম। পবিত্র কুরআনে আছে, "রোযা তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর ৩। এটা বলা হয় নাই যে রোযা ফরয। তাহলে ইসলাম ধর্মে রোযা সুন্নত, ফরয নহে।" সে বাধা দিয়ে বললো, "তুমি কি আমাকে বিশ্বাসচ্যুত করতে চেষ্টা করছ"?

---

১ সূরা মাঈদা, আয়াত ৯১।

২রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোন কিছু অধিক পরিমাণে গ্রহণ করার ফলে যদি সামান্য পরিমাণও নেশা হয়, তবে সে দ্রব্য সামান্য পরিমাণও গ্রহণ করা হারাম যদি তাতে নেশার ভাব নাও হয়"।

৩ সূরা বাকারা-আয়াত-১৮৪।

আমি উত্তর দিলাম "একজনের বিশ্বাস হচ্ছে তার অন্তরের পবিত্র বিষয়, তার আত্মার মুক্তির বিষয়, অন্যের অধিকার থেকে বিচ্যুত করা নয়। রাসূল(সঃ) কি বলেন নাই "বিশ্বাসই ভালবাসা"? আল্লাহ কুরআনুল করিমে কি ঘোষণা করেন নাই "আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (ইয়াকিন ①) স্থাপণ না করা পর্যন্ত তার প্রার্থনা করো না ②"? একজন যখন আল্লাহ এবং শেষ বিচার দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং হৃদয়কে সৌন্দর্যমন্ডিত করে, এবং কর্মকে সংশোধিত করে, সে হবে মানুষের মধ্যে পবিত্রতম ব্যক্তি। সে আমার এ কথাগুলোর উত্তরে কেবল মাথা নাড়ল।

এক সময় আমি তাকে বললাম, "নামায ফরয নয়"। "এটা কেমন করে ফরয নয়"? আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেছেন,"আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায পড়"③। সুতরাং নামাযের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহকে স্মরণ করা। তাহলে তো তুমি নামায না পড়েও আল্লাহকে স্মরণ করতে পারো।

সে বললো, হ্যাঁ। আমি শুনেছি কিছু লোক আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য নামায না পড়ে আল্লাহর জিকির করে ④। তার এ ধরনের কথায় আমি খুব খুশি হলাম। আমি তার এ ধারণাকে জোড়দার করা এবং তার হৃদয় জয় করতে চেষ্টা করলাম। পরে আমি লক্ষ্য করলাম যে সে নামাযের প্রতি ততটা গুরুত্ব দিত না এবং মাঝে মাঝে নামায পড়তো। বিশেষ করে সে ফজরের নামাজে অত্যন্ত অবহেলা করতো। তার কারণ আমি তাকে নানা বিষয়ে আলোচনার নামে মধ্যরাত পর্যন্ত জাগ্রত রাখতাম। তাই সে ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামায পড়তে ক্লান্তিবোধ করতো।

---

①লেখক [illegible] মতামত প্রকাশ করেছে যে এ [illegible] [illegible] এর অর্থ হচ্ছে "[illegible] [illegible]
②[illegible]।
③[illegible]।
④[illegible] "নামায হচ্ছে ইসলামের [illegible] বা পিলার। [illegible] আদায় [illegible] স্থাপন করেছে।" তিনি বলেছেন "যারা [illegible] করে না তারা [illegible] বিশ্বাস বিনষ্ট করেছে"। এবং অন্য [illegible] "[illegible] আদায় [illegible] করেছি" এ ভাবে নামায আদায় না [illegible] সঠিক ভাবে [illegible] করা অন্তর পবিত্রতা করে।

আমি নাজাদের মোহাম্মদের কাঁধ থেকে আস্তে আস্তে বিশ্বাসের চাদরটি নামিয়ে আনলাম। একদিন আমি তার সাথে রাসূল সম্পর্কেও বিতর্কে জুড়ে দিতে চেয়েছিলাম। তখন সে বললো "তুমি যদি আমার সাথে এ বিষয়ে নিয়ে আলাপ করতে চাও তাহলে আমাদের সম্পর্ক এখানেই শেষ এবং তোমার সাথে আমাদের বন্ধুত্বের এখানেই সমাপ্তি টানব।" এর পর থেকে রাসূলের সম্পর্কে আমি কথা বলা থেকে এ ভয়ে বিরত থাকি যাতে সকল প্রচেষ্টা বিনষ্ট না হয়ে যায়।
আমি সুন্নী এবং শিয়াদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি নতুন পদ্ধতি চালু করার জন্য তাকে উপদেশ দিলাম। সে আমার পরামর্শকে সমর্থন করল। কারণ সে ছিল একজন দাম্ভিক লোক। সাফিয়াকে ধন্যবাদ, আমি তার (নাজাদের মোহাম্মদ) গলায় রশি বাধতে পেরেছি।

কোন এক সময় আমি তাকে বললাম, "আমি শুনেছি যে রাসূল (সঃ) আছহাবদেরকে একে অন্যের ভাই এর সম্পর্ক তৈরি করেছেন। এটা কি সত্য?" তার উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ, আমি জানতে চাইলাম ইসলামের এ নিয়ম কি ক্ষণস্থায়ী না স্থায়ী। সে ব্যাখ্যা করলো, "ইহা চিরস্থায়ী"। রাসূল(সঃ) এর হালাল হচ্ছে এই দুনিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত হালাল এবং তাঁর হারাম হচ্ছে দুনিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত হারাম।" তখন আমি তার ভাই হওয়ার প্রস্তাব দিলাম। সুতরাং আমরা একে অপরের ভাই হলাম।

সে দিন থেকে আমি তাকে কখনও একা ফেলে যাইনি। আমরা এমনকি তার ভ্রমণের সময়ও একত্রে ছিলাম। সে ছিল আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কারণ যে বিষ বৃক্ষটি আমি রোপণ করেছি এবং তা বর্ধিত হচ্ছে, আমার যৌবনের মূল্যবান দিনগুলো ব্যয় করেছি, এখন গাছটি ফল দেয়ার অপেক্ষায়।

আমি লন্ডনে কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয়ে মাসিক রিপোর্ট পাঠাতাম। যে উত্তর আমি পেতাম তা ছিল খুব উৎসাহজনক এবং নিশ্চয়তাপূর্ণ। নাজাদের মোহাম্মদ আমার পরিকল্পিত পথেই চলতে শুরু করেছে।

আমার দায়িত্ব ছিল তাকে স্বাধীনচেতা, স্বাধীন মতামত প্রকাশ এবং সন্দেহবাদ সম্পর্কে উজ্জিবীত করা। আমি সর্বদা তার প্রশংসা করে বলতাম যে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তার জন্য অপেক্ষায় করছে।

এক দিন আমি তাকে নিম্নোক্ত মনগড়া স্বপ্নটি সাজিয়ে বললাম; "গত রাত্রে আমি আমাদের রাসূলকে স্বপ্নে দেখেছি। হুজ্জা থেকে শিখা ভাষায় আমি তাকে সম্বোধন করে বললাম। তিনি একটি মঞ্চে বসা ছিলেন। তার চারপাশে পন্ডিতরা ছিলেন, যাদেরকে আমি চিনি না। এমন সময় তুমি সেখানে প্রবেশ করলে। তোমার চেহারা ছিল জ্যোতির্লোকের ন্যায় উজ্জ্বল। তুমি রাসুল্লাহ (সঃ)-এর দিকে হেটে হেটে আগাচ্ছ। এবং তুমি তাঁর কাছে পৌছলে রাসূল (সঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং তোমার উভয় চক্ষুর মাঝামাঝি চুম্বন করলেন। তিনি বললেন, "আমার নামে তোমার নাম, তুমি আমার জ্ঞানের উত্তারাধিকারী, দুনিয়া এবং ধর্মীয় বিষয়ে তুমি আমার সহকারী।" তুমি তখন বললে, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার জ্ঞান জনগণের মাঝে ব্যাখ্যা করতে ভয় পাচ্ছি"। "তুমি মহান, ভয় পেয়োনা" মহা নবী উত্তর দিলেন।

মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব এ স্বপ্নের কথা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো। সে বার বার আমাকে জিজ্ঞাসা করলো আমি তাকে যা বলেছি তা সত্যি কিনা এবং যতবার সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে আমি ইতিবাচক জবাব দিয়েছি। পরিশেষে সে নিশ্চিত হয়েছে যে তাকে আমি যা বলেছি তা সবই সত্য। সেই থেকে জনগণের মাঝে একটি নতুন সম্প্রদায়① সৃষ্টির লক্ষ্যে সে তার নতুন ধারণা প্রকাশ করতে লাগল।

---

① *Al-Fajr-us-Sadiq বইটি বাগদাদের জামিল সাদিক [illegible] ইফেন্দি রচনা করেছেন। তিনি [illegible] ফানুন বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আকাইদ-ই-ইসলামিয়া [illegible] ছিলেন। তিনি ১৩৫৪ হিজরীতে (C.E. ১৯৩৬) মারা যান। বইটি ১৩২৩ হিজরীতে (C.E. ১৯০৫) মিসরে ছাপা হয়েছিল এবং ইস্তাম্বুলের [illegible] প্রকাশক পুন মুদ্রণ করে। এ বইয়ে বলা আছে "১১৪৩ হিজরীতে (১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে) নাজাদের মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব, ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের প্রচলিত ধারণাগুলো প্রবর্তন করেন। তিনি ১১১১ হিজরীতে (১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২০৭ হিজরীতে (১৭৯২ খ্রিস্টাব্দ) মারা যান। পরিবার আমির মোহাম্মদ বিন সাউদী কর্তৃক মুসলমানদের অনেক রক্তপাতের বিনিময়ে এ সম্প্রদায়টি বিস্তার লাভ করে। যারা বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী নয় ঐ ওহাবিদের মুসলমান বলা হয়। তারা বলে যে সকলকে (যারা ওহাবী নহে) অবশ্যই*

বাৎসরিক হজ্জ পালন করতে হবে এবং তাদের সকল পূর্ব পুরুষগণ ছয় শত বছর যাবৎ অবিশ্বাসী হিসাবে ছিল।

যারা ওয়াহাবি সম্প্রদায়কে মানতেন না তারা তাদের হত্যা করতো এবং তাদের মৃতদেহগুলো নিয়ে মিছিল করতো। তারা মুহাম্মদ(সঃ) কে অসৎ উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতো। তারা ফিকা, তফসির এবং হাদীস গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলতো। তারা তাদের নিজস্ব দৃষ্টি ভঙ্গি মতো কুরআনুল করিমের ভুল ব্যাখ্যা করতো। মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা বলতো যে তারা হানাবী মাজহাব। যাই হোক, অধিকাংশ হানাবি পণ্ডিতরাই সে সময় গ্রন্থ রচনা করে তাদের অস্বীকার করেন এবং তাদের প্রচলিত মতের বিরুধী হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তারা অবিশ্বাসী তার কারণ তারা বলে হারামকে হালাল বলে এবং তারা রাসূল(সঃ) ও আউলিয়াদের খাট করে দেখে। ওহাবী ধর্ম দশটি ভিত্তির প্রতিষ্ঠিত।

১। আল্লাহ শারীরিক কাঠামো বিশিষ্ট। তার হাত, মুখ এবং চেহাড়া আছে। [এ বিশ্বাস খ্রিষ্টান ধর্মমত সম্মত (পিতা পুত্র এবং পবিত্র আত্মা)]।
২। তারা তাদের নিজস্ব ধর্মমত অনুযায়ী কুরআনুল করিম-এর ব্যাখ্যা প্রদান করে।
৩। তারা সাহাবায় করিমদের বর্ণীত বিষয়গুলো প্রত্যাখান করে।
৪। তারা ইমামগণ বর্নীত বিষয়গুলো প্রত্যাখান করে।
৫। তারা বলে যে ব্যক্তিরা এক মাজহাবে সীমাবদ্ধ রয়েছে আসলে তারা অবিশ্বাসী।
৬। তারা বলে যারা ওহাবী নহে তারাই অবিশ্বাসী।
৭। তারা বলে যারা রাসূল এবং আউলিয়ার মাধ্যমে (তার নিজের এবং আল্লাহতালার মধ্যে) প্রার্থনা করে তারা অবিশ্বাসী।
৮। তারা বলে যারা রাসূল (সঃ) এবং আউলিয়াদের কবর জিয়ারত করা হারাম।
৯। যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর সপথ করে তারা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী।
১০। যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর শপথ করে এবং কোন আউলিয়ার কবরে কোন পশু বলিদান করে তারা বহু ঈশ্বরবাদী।

হ্যামফার নাজাদের মোহাম্মদকে যে ধর্মীয় নীতির উপর দাঁড় করেছিল ওহাবী ধর্মের এ দশটি নীতি একই রকম। যাই হোক, মুসলিম যুবকদের ব্রিটিশ ফাঁদ থেকে রক্ষার্থে আমরা এ বইটি প্রকাশ করছি।

প্রথম অংশ

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

নাজাদের মোহাম্মদ এবং আমি যখন খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলাম সে সময়ের কথা। লন্ডন থেকে বার্তা পেলাম আমাকে কারবালা এবং নাজাফ শহরে যাওয়ার জন্য নির্দেশ করা হয়েছে : এ দুটি ছিল জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকার কেন্দ্র, শিয়া সম্প্রদায়ের অতি জনপ্রিয় নগরী। তাই নাজাদের মোহাম্মদের সান্নিধ্য সমাপ্ত করে আমি বসরার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। তথাপি সন্তুষ্ট ছিলাম, কারণ আমি নিশ্চিত যে এ অজ্ঞ এবং নীতি-ভ্রষ্ট মানুষটি একটি নতুন ধর্মীয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে, যা ইসলামের মধ্যে থেকেই পর্যায়ক্রমে ইসলামকে ধ্বংস করবে এবং আমিই হচ্ছি এ নতুন ধর্মীয় সম্প্রদায় তৈরি করার কারিগর।

হযরত আলী হচ্ছেন সুন্নীদের চতুর্থ খলিফা এবং শিয়াদের মতে প্রথম খলিফা। তাঁকে নাজাফে দাফন করা হয়েছে। কুফা ছিল আলীর খেলাফতের রাজধানী। এর দূরত্ব ছিল নাজাফ থেকে প্রায় দের ক্রোশ যা পায়ে হেটে গেলে এক ঘন্টার পথ। যখন আলীকে হত্যা করা হয়, তাঁর পুত্র হাসান এবং হোসাইন তাঁকে কুফার বাহিরে সমাহিত করেন, যার বর্তমান নাম হচ্ছে নাজাফ। কালক্রমে নাজাফ শহর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কুফা বিলুপ্ত হতে থাকে। শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা দল বেধে নাজাফে আসতে থাকে। বাড়ীঘর, হাট বাজার, মাদ্রাসা (ইসলামিক স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করে।

নিম্নোক্ত কারণে ইস্তাম্বুলের খলিফা তাদের প্রতি দয়ালু এবং সহানুভূতিশীল ছিলেন-

১। ইরানের শিয়া প্রশাসন শিয়াদের সমর্থন করতেন। শিয়াদের প্রতি খলিফার হস্তক্ষেপই ছিল ইস্তাম্বুল এবং নাজাফের মধ্যে উত্তেজনার কারণ যা পরবর্তীতে যুদ্ধাবস্থার রুপ নেয়।

২। নাজাফের শিয়া অধিবাসীরা একাধিক সশস্ত্র উপদলে বিভক্ত ছিল। তারা শিয়াদের সমর্থন করতো। তারা অস্ত্রসস্ত্র এবং সংগঠনিক দিক দিয়ে খুব শক্তিশালি ছিল না। তাদের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়া খলিফার জন্য ছিল নির্বুদ্ধিতা।

৩। নাজাফের শিয়াদের পৃথিবীর সকল শিয়াদের উপর বিশেষ করে আফ্রিকা এবং ভারতের শিয়াদের উপর কর্তৃত্ব ছিল। খলিফা তাদের কোন অসুবিধা করলে তারা একত্রে তাঁর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠতো।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বড় নাতি, তাঁর কন্যা ফাতেমার পুত্র সন্তান, হুসেন বিন আলী, কারবালায় শহীদ হন। ইরাকের জনগণ হুসেনকে খলিফা নির্বাচন করার জন্য, তাঁকে ইরাকে আসার আহ্বান জানিয়ে মদিনায় সংবাদ প্রেরণ করেছিলেন। হুসেন ও তাঁর পরিবারবর্গ কারবালা এলাকায় এলে ইরাকীরা তাদের আগের উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে। তারা দামেস্কে বসবাসরত উমাইয়াদের খলিফা, মুয়াবিয়ার পুত্র এজিদের ইচ্ছে অনুযায়ী হুসেনকে গ্রেফতারের জন্য কাজ করে। হুসাইন এবং তাঁর পরিবার ইরাকী সৈন্যদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে জীবনের এক শেষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তাঁদের মৃত্যুর মাধ্যমে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। সুতরাং ইরাকী বাহিনী যুদ্ধে বিজয় লাভ করে। সে দিন থেকেই শিয়ারা কারবালাকে তাদের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাই সারা বিশ্ব থেকে বিপুল সংখ্যক শিয়ারা এখানে আসে। আমাদের খ্রিস্টান ধর্মে এ বিপুল লোকের সমাগমকে ভাল দৃষ্টিকে দেখে না।
কারবালা, শিয়াদের একটি শহর, এখানে শিয়াদের মাদ্রাসা আছে। নাজাফ এবং এ নগরী একটি অপরটিকে সমর্থন করে। এ নগরী দুটিতে যেতে নির্দেশ পাওয়ার পরে আমি বাগদাদের উদ্দেশ্যে বসরা ত্যাগ করলাম এবং ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী "হুল্লা" (হাওয়াই-ই-রমনীদের নৃত্য) নগরীতে পৌছলাম।
টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস নদী দুটি তুরস্ক থেকে ইরাকের ভূভাগ অতিক্রম করে পারস্য উপসাগরে গিয়ে মিশেছে। ইরাকের কৃষি এবং উন্নয়ন মূলত এই দুটি নদীর উপরই নির্ভরশীল।

লন্ডনে ফিরে গিয়ে আমি কমলওয়েলথ মন্ত্রণালয়কে এ দুটি নদীর বক্ষ পরিবর্তন করার জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে সুপারিশ করি, যাতে ইরাক আমাদের প্রস্তাব মানতে রাজী হয়। পানির প্রবাহ যখন কমে যাবে, তখন ইরাক আমাদের দাবী মানতে রাজী হবে।

একজন আজারবাইজানী ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে আমি হুল্লা থেকে নাজাফ পর্যন্ত ভ্রমণ করি। সে সব জায়গায় ধর্মীয় শিয়া সম্প্রদায়ের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপন করে, আমি তাদের বিপদগামী করা শুরু করি। আমি তাদের ধর্মীয় নির্দেশনার আলোচনা

অনুষ্ঠানগুলোতে যোগদান করি। আমি দেখলাম যে তারা সুন্নিদের মতো বিজ্ঞান পড়াশুনা করে না কিংবা তারা সুন্নিদেরমতো তাদের সুন্দর নৈতিক গুণাবলিও ধারণ করে না। উদাহরণ স্বরূপ।

১। তারা চরমভাবে তুরস্ক খিলাফত সরকারের প্রতি শুক্রভাবাপন্ন ছিল। কারণ তুর্কিরা হচ্ছে সুন্নি এবং তারা শিয়া। তারা বলে যে সুন্নিরা অবিশ্বাসী।
২। শিয়া পন্ডিতরা পরিপূর্ণ তাদের ধর্মীয় শিক্ষার উপর নির্ভরশীল এবং তারা পার্থিব জ্ঞানও অর্জনেও কম উৎসাহিত। এটা আমাদের ইতিহাসে পাদ্রীদের অচলাবস্থা কালীন সময়ের ঘটনার মতো।
৩। শিয়ারা ইসলামের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য এবং মহানুভবতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন কিংবা এ সময়ের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি প্রযুক্তি উন্নয়নে তাদের সামান্যতম ধারণা নাই।

আমি নিজকে নিজে বললাম, কি দুদর্শগ্রস্থ মানুষ হচ্ছে এ শিয়ারা! সমগ্র পৃথিবীর যখন জেগে উঠেছে তারা তখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। একদিন এক বন্যা এসে তাদের সব কিছু ভাসিয়ে নিবে। তাদেরকে খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য আমি বারংবার চেষ্টা করেছি। দুর্ভাগ্যবশত, কেউই আমার কথা শুনেনি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমার প্রতি এমনভাবে হাসলো যেন আমি তাদের পৃথিবী ধ্বংস করার কথা বলছি। কারণ তারা খলিফাকে সুরক্ষিত একটি দুর্গের মতো মনে করে, যা দখল করা অসম্ভব। তাদের মতে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একমাত্র ইমাম মেহেদীর (আঃ) অবির্ভাবেই এ এর পরিত্রাণ হতে পারে।
তাদের মতে, মেহেদী হচ্ছে তাদের ১২তম ইমাম এবং ইসলামের রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বংশধর। তিনি ২৫৫ হিজরীতে অন্তর্ধান হন। তিনি এখনও জীবিত আছেন বলে তারা বিশ্বাস করে এবং একদিন স্বশরীরে এসে হাজির হয়ে পৃথিবী থেকে সকল অত্যাচার, অনাচার ও অন্যায় দূর করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন।

এটা বিস্ময়কর! শিয়ারা কিভাবে এ রকম কুসংস্কারে বিশ্বাস করে! আমাদের খ্রিস্টান ধর্মমতে যেরূপ যীশুখ্রিস্ট আবার ফিরে আসবে এবং পৃথিবীতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবে, এটিও তেমন একটি কুসংস্কার।

একদিন তাদের একজনকে আমি বললাম: "ইসলামের রাসূলুল্লাহ(সঃ)- এর মতো অন্যায় কাজকে প্রতিরোধ করা কি তোমার প্রতি ফরয নয়?" তার উত্তর ছিল, "তিনি অন্যায় কাজে বাধা দিতে পারতেন কারণ আল্লাহ তাঁকে সহায়তা করতেন"।

যখন আমি বললাম কুরআনে লেখা রয়েছে, "যদি তুমি আল্লাহর ধর্মকে সহায়তা কর, তিনিও বিনিময়ে তোমাকে সহায়তা করবেন"১।

"যদি তুমি তোমার বাদশাহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর, আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন।" সে উত্তর করলো তুমি একজন ব্যবসায়ী। এগুলো হচ্ছে রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়, তুমি তা বুঝবেনা।

আমিরুল মোমেনীন হযরত আলীর সমাধি জমকালোভাবে সাজানো ছিল। এর একটি চমৎকার উদ্যান আছে, স্বর্ণ খচিত গম্বুজ এবং দুটি লম্বা মিনার আছে। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক শিয়ারা এ সমাধি জিয়ারত করে। তারা এখানে জামাতে নামায আদায় করে। প্রত্যেক দর্শনার্থী প্রথমে দরজার কাছে থেমে তাতে চুম্বন করে এবং দোয়া করে। তারা অনুমতি নেয়ার পরে ভিতরে প্রবেশ করে। সমাধিস্থলে রয়েছে বিশাল এক চত্বর। এখানে ধর্মীয় লোকজন এবং পর্যটকদের জন্য রয়েছে অনেকগুলো কক্ষ। হযরত আলীর সমাধিক্ষেত্রের অনুরূপ কারবালাতে আরো দুটি সমাধিক্ষেত্র রয়েছে।

এর একটি হচ্ছে হুসাইন-এর এবং অন্যটি হচ্ছে তার সাথে কারবালায় শহীদ হয়েছেন তার ভাই আব্বাস এর। শিয়ারা নাজাফে যেভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করে কারবালাতেও তারই পুনরাবৃত্তি করে। নাফাজের চেয়ে কারাবালার আবহাওয়া ভাল। ইহা নয়নাভিরাম বাগান এবং ছোট নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত।

ইরাকে আমার দায়িত্ব পালন করার সময় আমি এমন এক দৃশ্য দেখি যা আমার অন্তরকে উৎফুল্ল করে। কিছু ঘটনা অটোমান সামাজ্যের পতনের চিহ্ন ফুটে ওঠে। একটি হলো ইস্তাম্বুলের প্রশাসন কর্তৃক যে গভর্নর নিয়োগ দেয়া হয়েছিল তিনি ছিলেন একজন অশিক্ষিত এবং উগ্র প্রকৃতির মানুষ। সে সেচ্ছাচারী ছিল।

জনগণ তাকে পছন্দ করত না। গভর্নর সুন্নিদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতো এবং তাদের মূল্যায়ণ না করায় তারা তার প্রতি বিরক্ত ছিল। নবী(সঃ)-এর বংশধরসৈয়দ২ বং শরিফদের৩ মধ্যে যোগ্য লোককে গভর্নর নির্বাচন করা অধিকতর শ্রেয়। তা না করে একজন তুর্কিকে গভর্নর নির্বাচন করায় শিয়ারাও ছিল ক্রুদ্ধ।

১সূরা মুহাম্মদ, আয়াতঃ৭। আল্লাহতায়ালার ধর্মকে সাহায্য করার অর্থ হচ্ছে নিজ থেকেই শরিআহ আইনগুলো প্রয়োগ করতে চেষ্টা করা এবং তা প্রচার করা।

২ইমাম হযরত হুসাইন (রাঃ) -এর বংশধর।

৩ ইমাম হযরত হাসান (রাঃ) -এর বংশধর।

শিয়ারা ছিল সম্পূর্ণ দুর্দশাগ্রস্থ। তারা নোংরা এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে বাস করতো। তাদের রাস্তা-ঘাট নিরাপদ ছিলনা। মহা-সড়কে লোকেরা গাড়িবহরের জন্য অপেক্ষা করতো এবং গাড়িবহরে সৈন্যদের প্রহরা না থাকলে তারা তাদের আক্রমণ করতো। এ কারণে সরকার নিরাপত্তা বিধান না করলে কোন গাড়ির বহর বের হতো না।

উপজাতীয় শিয়ারা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকতো। তারা খুন করতো এবং একে অন্যের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস লুণ্ঠন করতো। তাদের মধ্যে অশিক্ষা এবং মূর্খতা সাংঘাতিকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। শিয়াদের এ অবস্থা আমাকে ইউরোপে চার্চের আগ্রাসনের কথা মনে করিয়ে দেয়।
নাজাফ ও কারবালায় বসবাস রত ধর্মীয় নেতা এবং অল্পসংখ্যক লোক যারা ইবাদাতে মসগুল থাকতো, তাদের কথা বাদ দিলে এক হাজারে একজন শিয়াও লেখাপড়া জানতো না।

অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পরেছিল এবং জনগণ মারাত্মক দারিদ্র্যতায় ভোগছিল। প্রশাসনিক ব্যবস্থাও কাজ করছিল না। শিয়ারা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

রাষ্ট্র এবং জনগণ একে অপরের প্রতি সন্দিহান হয়ে পরে। ফলে তাদের মধ্যে কোন পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ছিল না। শিয়াধর্মীয় নেতারা সম্পূর্ণভাবে সুন্নিদের অপবাদ দিত, তারা ইতোমধ্যেই জ্ঞান চর্চা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম এবং এসকল দুনিয়াবী কাজ কর্ম ছেড়ে দিয়েছিল।

আমি কারবালায় এবং নাজাফে চার মাস অবস্থান করি। নাজাফে আমি মারাত্মক ভাবে অসুস্থ হয়ে পরি। আমি এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়ি যে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমি তিন সপ্তাহ অসুস্থ ছিলাম। আমি একজন চিকিৎসকের কাছে গেলাম। তিনি আমাকে একটা ব্যবস্থাপত্র দিলেন। ঔষধ খেয়ে আমি সুস্থ হতে লাগলাম। অসুস্থকালীন সময়ে আমি মাটির নিচে একটি কক্ষে থাকতাম। আমি অসুস্থ বলে আমার গৃহকর্তা সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে আমার ঔষধ ও খাবার তৈরি করে দিত এবং আমাকে সেবা করার জন্য সে অনেক

সওয়াবের আশা করতো। কারণ, বলতে গেলে আমি ছিলাম খলিফা আমীরুল মোমিনিনের মেহমান। প্রথম কয়েক দিন ডাক্তার আমাকে শুধু মুরগির সুপ খেতে বললেন। এরপর আগের মতো মুরগির মাংস খেতে অনুমতি দিলেন। তৃতীয় সপ্তাহে ভাতের জাউ খেলাম। সুস্থ হওয়ার পর আমি আবার বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। আমি নাজাফ, হুল্লা এবং বাগদাদ ভ্রমণকালীন সময়ে আমার পর্যবেক্ষণের উপর একশত পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট তৈরি করলাম। কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয়ে বাগদাদ প্রতিনিধির কাছে আমার রিপোর্ট দাখিল করলাম। আমি ইরাকে অবস্থান করব না লন্ডনে ফিরে যাব সে জন্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের অপেক্ষা করছিলাম।

আমি লন্ডনে ফিরে যাওয়ার আশা করছিলাম। কারণ আমি দীর্ঘ সময় ধরে প্রবাসে আছি। আমি আমার জন্মভূমি এবং আমার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। বিশেষ করে আমার ছেলে রাসপুটিনকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল। আমার দেশ ছেড়ে চলে আসার পর তার জন্ম হয়েছে। সে কারণেই আমার রিপোর্টের সাথে কিছুদিনের জন্য হলেও লন্ডন যাওয়ার অনুমতি চেয়ে একটি দরখাস্ত করেছিলাম। আমি আমার এ তিন বছরের ইরাক মিশনের ধারণার উপর একটি মৌখিক রিপোর্ট প্রদান করা এবং এ সময়ের মধ্যে কিছুটা বিশ্রাম নিতে চেয়েছিলাম।

মন্ত্রণালয়ের ইরাক প্রতিনিধি তার সাথে ঘন ঘন দেখা না করার জন্য আমাকে উপদেশ দেন, তাহলে আমি সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত হতে পারি। তিনি আমাকে টাইগ্রিস নদীর পাড়ের কোন হোটেলে একটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে থাকতে বললেন এবং বললেন "লন্ডনে থেকে মেইল গ্রহণ করার পরে আমি তোমাকে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত জানাবো"। বাগদাদে অবস্থানকালে আমি খিলাফতের রাজধানী ইস্তাম্বুল এবং বাগদাদের মধ্যে ব্যাপক আধ্যাত্মিক দূরত্ব লক্ষ্য করি।

আমি কারবালা এবং নাজাফের উদ্দেশ্যে বসরা ত্যাগ করার সময় বেশ উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলাম যে নাজাফের মোহাম্মদ আমার দেয়া নির্দেশনা থেকে সরে এসেছে কিনা। কারণ সে ছিল মাত্রাতিরিক্ত অস্থির এবং বিচলিত ব্যক্তি। আমি চিন্তিত ছিলাম, যে লক্ষ্য নিয়ে আমি তাকে তৈরি করেছি তা কি না আবার ধ্বংস হয়ে যায়।

আমি চলে আসার সময় সে ইস্তাম্বুল যাওয়ার কথা চিন্তা করছিল। আমি তাকে এ ধারণা থেকে দূরে সরানোর জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। আমি তাকে বললাম," আমি যথেষ্ট উৎকণ্ঠার মধ্যে আছি, সেখানে গিয়ে যখনই তুমি কোন বক্তব্য প্রদান করবে, তারা তোমাকে ধর্মদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করবে এবং তোমাকে হত্যা করবে"।

আমার ধারণা সম্পূর্ণ অন্যদিকে ঘুরপাক খাচ্ছিল। আমি এ জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলাম যে সেখানে গিয়ে সুন্নি মনীষীদের সাথে দেখা করলে, তারা তার চিন্তা-ভাবনাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করে আবার তাকে সুন্নি মতাদর্শে ফিরিয়ে নিতে পারে। তাহলে আমার সকল স্বপ্ন ধুলিসাৎ হয়ে যাবে। কারণ ইস্তাম্বুলে ইসলামের জ্ঞান এবং সৌন্দর্যময় নৈতিক মূল্যবোধ বিদ্যমান ছিল।

আমি যখন দেখলাম যে নাজাদের মোহাম্মদ বসরায় থাকতে চাচ্ছে না, আমি তখন তাকে ইসফাহান এবং সিরাজে যাওয়ার জন্য সুপারিশ করলাম। কেননা এই দুটি নগরী ছিল আকর্ষণীয় এবং তার অধিবাসীরা হচ্ছে শিয়া। শিয়ারা সম্ভবত নাজাদের মোহাম্মদকে প্রভাবিত করতে পারবে না। কারণ তাদের জ্ঞান ও যুক্তি অপর্যাপ্ত। এভাবে আমি নিশ্চিত হলাম যে আমার কাজের পরিকল্পনা তারা পরিবর্তন করতে পারবে না।

আমি তার কাছ থেকে চলে আসার সময় যাকাত হিসেবে তাকে কিছু অর্থ দিলাম। যাকাত হচ্ছে এক ধরনের ইসলামিক ট্যাক্স যা দারিদ্র্যতা মোচন করার জন্য সংগ্রহ করা হয়। এ ছাড়াও আমি তাকে ছদগা হিসাবে একটি পশু দিলাম। অতঃপর আমরা বিদায় নিলাম।

চলে আসার পর তার সাথে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এটা আমাকে সম্পূর্ণ অস্বস্থিকর অবস্থায় ফেলে। বিদায় নেয়ার সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা উভয়ে আবার বসরায় ফিরে আসব। যে আগে ফিরে আসবে, সে অন্যকে খুঁজে না পেলে একটি চিঠি লিখে যেন আবদুর রিদা'র কাছে রেখে দেয়।

প্রথম অংশ

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

আমি কিছুদিনের জন্য বাগদাদে অবস্থান করি। পরে লন্ডনে ফিরে যাওয়ার জন্য সংবাদ পাই এবং লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। লন্ডনে আমি মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারীসহ কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে কথা বলি। আমি আমার দীর্ঘ মিশনে কর্মকাণ্ড ও পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে তাদের অবহিত করি। ইরাক সম্পর্কে আমার দেওয়া তথ্যে তারা আনন্দিত হয়ে ওঠেন এবং বললেন যে তারা খুশি হয়েছেন। অন্যদিকে নাজাদের মোহাম্মদের বান্ধবী সাফিয়া আমার রিপোর্টের অনুরূপ একটি রিপোর্ট প্রেরণ করে। আমি আরো জানতে পারি যে, আমার মিশনের সমস্ত সময় জুড়ে মন্ত্রণালয়ের লোক আমাকে অনুসরণ করতো। আমি সেক্রেটারীর কাছে যে রকম রিপোর্ট পাঠিয়েছি, তারাও আমার রিপোর্টের অনুরূপ রিপোর্ট পাঠাতো।

মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য সেক্রেটারী আমাকে একটি সময় নির্ধারণ করে দেন। মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করার সময় তিনি আমার সাথে এমন সৌজন্য প্রদর্শন করলেন যা ইস্তাম্বুল থেকে আসার পর তিনি তেমন সম্মান প্রদর্শন করেন নি। আমি বুঝে নিয়েছি যে এখন থেকে আমি তার হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান দখল করে ফেলেছি।

নাজাদের মোহাম্মদকে আমাদের উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য করায়ত্ত করেছি জেনে মন্ত্রী খুব খুশি হলেন। তিনি বললেন, "সে আমাদের একটি হাতিয়ার, আমাদের মন্ত্রণালয় তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে সকল ধরনের প্রতিশ্রুতি দাও"। তিনি বললেন, নতুন ধারণার বিষয়ে তাকে প্রশিক্ষিত করার জন্য তুমি তোমার সকল সময় ব্যয় করলে তা আমাদের বিরাট ফল বয়ে আনবে। যখন আমি বললাম, "আমি নাজাদের মোহাম্মদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। সে তার মনোভাব পরিবর্তন করে ফেলতে পাওে"। তিনি উত্তর দিলেন, "চিন্তা করোনা। তুমি তাকে ছেড়ে আসার সময় যে ধারণা তার মাথায় ছিল তা সে ছেড়ে দেয় নি"। আমাদের মন্ত্রণালয়ের গোয়েন্দারা ইস্পাহানে তার সাথে দেখা করেছে এবং মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে যে, তার (নাজাদের মোহাম্মদের) কোন পরিবর্তন হয়নি। আমি নিজে নিজে বললাম, "কিভাবে নাজাদের মোহাম্মদ একজন আগান্তুকের কাছে তার মনের গোপন কথা

প্রকাশ করবে"? মন্ত্রীকে আমার এ কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না। যাই হোক, পরে আমি যখন নাজাদের মোহাম্মদের সাথে সাক্ষাৎ করি তখন জানতে পারলাম যে, ইস্পাহানে আবদ-উল-করিম নামে একজন লোক নিজেকে আমি শেখ মোহাম্মদের ভাই (অর্থাৎ আমি) হিসেবে পরিচয় দিয়ে তার সাথে মিলিত হয়েছে এবং সকল গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করেছে। তিনি আমাকে বলেছেন যে, সে তোমার সম্পর্কে সব কিছু জানে।

নাজাদের মোহাম্মদ আমাকে বলল, "সাফিয়া আমার সাথে ইসফাহান গিয়েছিল এবং আমরা আরো দু মাসের জন্য মুতানিকাহ করেছি। আবদ-উল-করিম আমার সাথে সিরাজে গিয়েছিল। সে সাফিয়ার চেয়েও সুন্দরী ও আকর্ষণীয় আয়েশা নামে এক রমণীর সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়। আমি ঐ রমণীর সাথেও মুতানিকাহ করি। তার সাথে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দঘন দিনগুলো অতিবাহিত করেছি"।

পরে আমি জানতে পারি যে, আবদ-উল-করিম একজন খ্রিস্টান এজেন্ট এবং ইস্পাহানের জেলফা জেলায় মন্ত্রণালয়ের পক্ষে কাজ করতো। আয়েশা একজন ইহুদী, সে সিরাজে বসবাস করতো। সেও একজন এজেন্ট এবং মন্ত্রণালয়ের পক্ষে কাজ করতো। আমরা চারজনই সমন্বিতভাবে নাজাদের মোহাম্মদকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিতাম যাতে সে ভবিষ্যতে আমরা যেরকম চাই তেমন সুন্দরভাবে কাজ করতে পারে।

আমি যখন এ বিষয়গুলো মন্ত্রী, সচিব এবং মন্ত্রণালয়ের অন্য দুই অপরিচিত সদস্যদের সামনে উত্থাপন করলাম, তখন মন্ত্রী আমাকে বললেন, "তুমি মন্ত্রণালয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়েছ।" কারণ মন্ত্রণালয়ের অন্য সকল গুরুত্বপূর্ণ এজেন্টদের চেয়ে তুমি সেরা এজেন্ট। সেক্রেটারী তোমাকে কিছু রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য জানাবে, যা তোমার মিশনের কাজে সহায়াক হবে"।

তখন তারা পরিবার-পরিজনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমাকে দশ দিনের ছুটি মঞ্জুর করেন। অতঃপর আমি সরাসরি বাড়ি চলে গেলাম এবং আমার ছেলের সাথে কিছু মধুর সময় অতিবাহিত করলাম। সে সব সময় আমার কথা মনে করতো। আমার ছেলে আধো আধো কথা বলতে পারে এবং এমন ভঙ্গিমায় হাঁটে যে আমি অনুভব করি সে আমার শরীরেরই একটি অংশ। আমি যথেষ্ট উল্লাস ও সুখের সঙ্গে এ দশ দিন ছুটি অতিবাহিত করছি। আমার মনে হচ্ছে আমি আনন্দের অতিসায্যে

ভেসে বেড়াচ্ছি। বাড়িতে ফিরে এসে পরিবারের সথে এরকম আমি মহানন্দে কাটিয়েছিলাম। এ দশদিনের ছুটিতে আমি আমার ফুফুর সাথে দেখা করি। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ফুফুর সাথে দেখা করার জন্য এটাই ছিল আমার জন্য যথোপযুক্ত সময়। কারণ আমার তৃতীয় মিশনে যাওয়ার পরে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর সংবাদ শুনে আমি অত্যন্ত দুঃখ পেয়ে ছিলাম।

এ ছুটির দশদিন এক ঘণ্টারমতো দ্রুত কেটে গেল। সুখের দিন এভাবে এক ঘণ্টার মতো দ্রুত কেটে যায় অথচ সে রকম দুঃখ কষ্টের দিন কাটতে মনে হয় শত শত বছর লেগে যায়। নাজাফে অসুস্থ হয়ে পরার দিনগুলোর কথা মনে পরে। তখন এক একটা দিন আমার কাছে একটা বছরের মতো মনে হতো।

নতুন নির্দেশ গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ে গিয়ে আমি সেক্রেটারীর হাস্যোজ্জ্বল মুখ এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গুণাবলির সাক্ষাৎ পেলাম। আমার সথে তিনি এমন উষ্ণ করমর্দন করলেন যেন মনে হলো তার সব ভালোবাসা তিনি আমার জন্য উজাড় করে দিলেন।

তিনি আমাকে বললেন, মন্ত্রী ও উপনিবেশসমূহের কমিটির ভারপ্রাপ্তের নির্দেশ মতো আমি তোমাকে দুটি রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য সম্পর্কে বলব। পরবর্তী সময়ে তুমি এ দুটি গোপন তথ্যের দ্বারা অত্যন্ত উপকৃত হবে। মাত্র কয়েকজন বিশ্বস্ত লোক ছাড়া অন্য কাকেও এ গোপন তথ্য সম্পর্কে কিছু জানানো হয় নি।"

তিনি আমার হতে ধরে আমাকে মন্ত্রণালয়ের একটি কক্ষে নিয়ে গেলেন। এ কক্ষটিতে আমি বেশ কিছু আকর্ষণীয় বিষয় দেখতে পেলাম। দশজন লোক একটি গোল টেবিলের চারিদিকে বসে আছে। প্রথম ব্যক্তিকে অটোমান সম্রাটের বেশ ধারণ করানো হয়েছে। তিনি ইংরাজী ও তুর্কি ভাষায় কথা বলছেন। দ্বিতীয় জনকে ইস্তাম্বুলের শাইখ-উল-ইসলাম(ইসলাম বিষয়ক প্রধান)-এর অনুরূপ পোশাক পরিধান করানো হয়েছে। তৃতীয়জনকে ইরানের শাহ্ এর অনুরূপ পোশাক পরিধান করানো হয়েছে। চতুর্থজন ছিল ইরানের রাজ প্রাসাদের Vizier-এর অনুরূপ। পঞ্চমজনকে নাজাফের শিয়াদের নেতৃত্বদানকারী মহান শিয়া মনীষীর মতো পোশাক পরিধান করানো হয়েছে। তাদের মধ্যে সর্বশেষ তিনজন ইংরাজী ও ফারসি ভাষায় কথা বলছিলেন। এ পাঁচজনের প্রত্যেকের পাশে একজন করে সহকারী বসা ছিল এবং তারা যা বলছিলেন তা লিখছিল। ইস্তাম্বুল, ইরান এবং নাজাফে গুপ্তচররা

মূলকাজের বিষয়ে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছে তা এ সহকারীগণ উক্ত পাঁচ ব্যক্তিকে অবহিত করছিল।

সেক্রেটারী বললেন, "এ পাঁচজন লোক সেখানের পাঁচ জনের প্রতিনিধিত্ব করছে। তাদের আদর্শিক চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে জানার জন্য এ লোকদের আমরা তাদের (যাদেরকে তারা অনুসরণ করছে) অনুরূপ করে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। ইস্তাম্বুল তেহরান ও নাজাফে তাদের সম্পর্কে যে সব তথ্য আমরা পাচ্ছি তা তাদের প্রকৃত অবস্থার সাথে খতিয়ে দেখছি এবং এ লোকরা ঐ স্থানগুলোতে নিজদেরকে তাদের প্রকৃত আসল লোকদের অনুরূপ ভাবতে চেষ্টা করছে। পরে আমরা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবো এবং তারা উত্তর দেবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ লোকরা যে উত্তর দিবে তা তাদের আসল লোকদের প্রদত্ত উত্তরের সাথে শতকরা ৭০ ভাগই মিলে যাবে।
"তুমি ইচ্ছা করলে তাদের কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করে দেখতে পারো। তুমি তো ইতোমধ্যে নাজাফের মনীষীদের সাথে দেখা করেছে।" আমি হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলাম। কারণ আমি নাজাফের প্রধান শিয়া মনীষীর সাথে সাক্ষাত করেছি এবং তার সম্পর্কে কিছু বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছি। এখন আমি তার অবিকল নকল ব্যক্তির প্রতি জিজ্ঞেস করলাম, প্রিয় ওস্তাদ, সুন্নি ও ধর্মান্ধ সরকারের বিরুদ্ধে কি যুদ্ধ ঘোষণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে?" তিনি মুহূর্ত কাল বিলম্ব না করে বললেন, "না সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ তারা সুন্নি। তারা মনে করে সকল মুসলমান ভাই ভাই। আমরা কেবলমাত্র তখনই তাদের (সুন্নি মুসলমান) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি যখন তারা উম্মতের (মুসলমান) বিরুদ্ধে উন্মত্ততা ও ধর্ম বিশ্বাসের জন্য নিপীড়ন চালায়। এবং এ ক্ষেত্রে আমরা তাদের সৎ কাজের আদেশ প্রদান করা (অমর-ই-বিই-ল মারুফ①) ও অসৎ কাজের নিষেধ করার (নাহি-ই-আনি-ল মুনকার②)-এ নীতিটি পর্যবেক্ষণ করবো। যখনি তারা নিপীড়ন বন্ধ করবে আমরা আমদের হস্তক্ষেপ করাও বন্ধ করবো।"

আমি বললাম, "প্রিয় ওস্তাদ, ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা খারাপ লোক এ ব্যাপারে কি আমি আপনার অভিমত জানতে পারি?"। তিনি বললেন, "হ্যাঁ তারা খারাপ লোক।" "তাদের কাছ থেকে দূরে থাকা উচিত"।

---

① [illegible] শিক্ষা [illegible] প্রয়োগ করা।
② ইসলামী [illegible] বিরোধী [illegible] প্রতিরোধ করা।

আমি এর কারণ জানতে চাইলে তিনি উত্তর দিলেন, "প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য এভাবে তাদের অবমাননা করা হয়। কারণ তারা আমাদেরকে কাফির মনে করে এবং আমার নবী মুহাম্মদ(সঃ)'কে অস্বীকার করে। সুতরাং এ কারণে আমরা প্রতিশোধপরায়ণ"। আমি তাকে বললাম, "প্রিয় ওস্তাদ, পরিচ্ছন্নতা কি ঈমানের ক্ষেত্রে কোন ইস্যু নয়? তা সত্ত্বেও, সান-ই-শরীফ (হযরত আলীর সমাধিক্ষেত্র এলাকা) এর সড়ক ও মহাসড়ক পরিচ্ছন্ন নয়। এমনকি মাদ্রাসাগুলো যেখানে জ্ঞান দান করা হয়, সেখানেও পরিচ্ছন্ন বলা যায় না।"

তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ এটা সত্য; পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। তারপর ও এটা পরিচ্ছন্ন রাখা যায় নি কারণ শিয়ারা পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে উদাসীন।"

মন্ত্রণালয়ে এ লোকটি যে উত্তর দিয়েছে এবং আমি নাজাফে শিয়া মনীষীর কাছ থেকে যে উত্তর পেয়েছিলাম তা হুবহু একই রকম। এ লোক এবং নাজাফের শিয়া মনীষীর একই ধরনের উত্তর আমাকে আর্শ্চান্বিত করলো? তার উপর এ লোকটিও তাদও মতোই ফারসিতে কথা বলতে পরে।

সেক্রেটারী বললেন, "তুমি যদি অন্য চার জন লোকের মডেলের সাথে কথা বলো, তুমি যদি তাদের সীমাবদ্ধতা নিয়েও কথা বল, তাহলে দেখবে যে আসল লোকের সাথে হুবহু মিল রয়েছে। যখন আমি বললাম, সাইখ-উল-ইসলাম কিভাবে চিন্তা করেন আমি তা জানি। কারণ ইস্তাম্বুলে আমার হোজ্জা আহমদ ইফেন্দি সাইখ-উল-ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছিলেন। সেক্রেটারী বললেন, তাহলে তুমি এগিয়ে যাও এবং তার মডেলর সথে কথা বলো।" আমি সাইখ-উল-ইসলাম-এর মডেলের কাছে এগিয়ে গেলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "খলিফাকে অনুগত্য করা কি ফরয"? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ এটা ওয়াজিব। এটা ওয়াজিব, যে রকম আল্লাহ ও রাসূলকে মান্য করা ফরয। আমি যখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম এটা প্রমাণ করার জন্য তার কাছে কি দলিল আছে? তিনি উত্তর করলেন তুমি কি আল্লাহর জবাব-ই-আল্লাহ আয়াত (Janâb-i-Allah's âyat) শোননি, যেখানে বলা হয়েছে "আল্লাহ ও রাসূলকে মান্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে উলুল অমর কে মান্য কর ১"। আমি বললাম, "এতে কি তাই মনে হয় যে, আল্লাহ আমাদেরকে খলিফা ইয়াজিদকে মান্য করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন?"

১সূরা নিসা আয়াত-৫৯।

"যিনি তার সেনাবাহিনী দ্বারা মদিনাকে লণ্ডভণ্ড করেছে এবং যিনি আমাদের রাসূলের দৌহিত্র হুসেইনকে হত্যা করেছে এবং ওয়ালিদকে হত্যা করেছে, এবং সে ছিল একজন মদ্যপ"?

তার উত্তর ছিল এরকম, "হে আমার পুত্র, ইয়াজিদ আমিরুল মোমেনিন হয়েছিল আল্লাহর অনুমতিতেই।

তিনি হুসেইনকে হত্যার নির্দেশ দেয়নি। শিয়াদের মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করোনা। ভালো করে পড়াশুনা কর। তিনি একটা ভুল করেছিলেন। এর জন্য তিনি তওবা (অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং অনুগ্রহ আশা করা) করেছিলেন। মদিনা-ই-মুনাওয়ারা লন্ডভন্ড করতে নির্দেশ দেয়া তার জন্য সঠিক ছিল। কারণ মদিনার অধিবাসীদের অবস্থা ছিল নিয়ন্ত্রণহীন এবং অবাধ্য। ওয়ালিদের কথা বলছ; হ্যাঁ সে একজন ছিল পাপী। খলিফাকে অনুকরণ করা ওয়াজিব না, কিন্তু তার শরীআত সম্মত নির্দেশসমূহ মান্য করতে হবে"। আমি এ একই প্রশ্নগুলো আমার হোজা আহমেদ ইফেন্দিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া আমি একই ধরনের উত্তর পেয়েছিলাম।

অতঃপর আমি সেক্রেটারীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "এ মডেলসমূহ প্রস্তুতের চূড়ান্ত কারণ কি?" তিনি বললেন, "এই পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা (অটোমান) সুলতান এবং শিয়া এবং মুসলমান মনীষীদের মানসিক ক্ষমতা যাচাই করছি, হোক সে শিয়া কিংবা সুন্নি। আমরা এমন পদক্ষেপের অনুসন্ধান করছি যা তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমাদের কাজে লাগবে। উদাহরণ স্বরূপ, শত্রু সৈন্য কোন দিক থেকে আসবে তা যদি তোমার জানা থাকে, তাহলে তুমি সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে পারবে, সৈন্যদেরকে সুবিধাজনক স্থানে রাখতে পারবে এবং শত্রুর মূলোৎপাটন করতে পারবে। অপরপক্ষে, তুমি যদি শত্রু সৈন্যর নির্দেশনাসমূহ সম্পর্কে নিশ্চিত না থাক, তাহলে আক্রমণে তোমার সৈন্যরা এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত এবং বিশৃঙ্খলভাবে থাকবে এবং তোমাকে পরাজয় বরণ করতে হবে। একইভাবে, মুসলমানরা তাদের বিশ্বাস প্রমাণ করার জন্য দলিল পেশ করবে, তাদের মাজহাব সঠিক, তুমি যদি দলিল সম্পর্কে জান, তাহলে তোমার পক্ষে এ দলিলের সাহায্যে তাদের বিশ্বাসকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে পারবে। তারপর তিনি আমাকে এক হাজার পৃষ্ঠার একটি বই দিলেন যাতে উপরোক্ত পাঁচ প্রতিনিধির বিষয়, এলাকার সামরিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও ধর্ম সম্পর্কে সংগৃহীত পর্যবেক্ষণ ফলাফল ও বিভিন্ন প্রকল্পের বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল। তিনি বললেন, "দয়া করে বইটি পড়ো এবং বইটি

আমাদের কাছে ফেরত দিও "। আমি বইটি বাড়িতে নিয়ে গেলাম। আমার তিন সপ্তাহের ছুটিকালীন সময়ে আমি বইটি মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। এটি একটি চমৎকার বই। প্রয়োজনীয় উত্তর, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণসহ বইটিতে ছিল সঠিক গাইড লাইন। আমার মনে হলো যে, প্রতিনিধি পাঁচ জন যে সকল দিয়েছেন তা তাদের মডেলের আসল ব্যক্তিদের প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে শতকরা ৭০ ভাগের ও বেশি মিল রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সেক্রেটারী সাহেব বলেছেন, এ উত্তরগুলো সত্তর ভাগ সঠিক।

বইটি পড়ার পরে, এখন আমি আমার রাষ্ট্রের প্রতি অধিক মাত্রায় আস্থাশীল। আমি নিশ্চিত ভাবেই জানি যে আটোমান সম্রাটকে এক শতাব্দীর কম সময়ে ধ্বংসের পরিকল্পনার জন্য ইতোমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। সেক্রেটারি আরো বললেন, "একই ধরনের অন্যান্য কক্ষে যে সকল দেশে উপনিবেশ রয়েছে এবং যে সকল দেশে উপনিবেশ তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের জন্য আমাদের পরিচিতিমূলক টেবিল রয়েছে।

অতঃপর আমি সেক্রেটারিকে জিজ্ঞেস করছিলাম, তারা কোথায় এমন অনুগত ও মেধাসম্পন্ন লোক খুঁজে পেলেন। তিনি উত্তর দিলেন, "সারা পৃথিবী থেকে আমাদের এজেন্টরা প্রতিনিয়ত গোয়েন্দা রিপোর্ট পাঠাচ্ছে। তুমি দেখতে পাচ্ছ, এ প্রতিনিধিরা তাদের কাজে অত্যন্ত দক্ষ। স্বাভাবিকভাবেই তোমাকে যদি কোন ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত সকল তথ্য প্রদান করা হয়, তাহলে তুমিও তার মতো চিন্তা করতে পারবে এবং তার মতোই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। তার জন্য তুমিও বিকল্প হতে পার"। সেক্রেটারি চলে যাওয়ার সময় বললেন, "সুতরাং এটাই ছিল তোমার জন্য প্রথম গোপন বিষয় যা মন্ত্রনালয়ের পক্ষ থেকে তোমাকে জানানোর জন্য বলা হয়েছিল"।
"আমি তোমাকে দ্বিতীয় গোপন বিষয়টি জানাবো, যখন তুমি এক মাস পর এ এক হাজার পৃষ্ঠার বইটি ফেরত দিবে"।

আমি বইয়ের প্রতিটি অংশ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়লাম। মুহাম্মদ সম্পর্কে আমার তথ্য অনেক সমৃদ্ধ হয়। আমি বুঝতে পারি যে কিভাবে তারা চিন্তা করে, তাদের দুর্বলতাগুলো কি কি, কি তাদেরকে এমন শক্তিশালী হিসেবে তৈরি করে এবং কিভাবে তারা তাদের শক্তিশালী গুণাবলীগুলো দুর্বল দিকগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করে।
মুসলমানদের দূর্বল দিকসমূহ বইয়ে নিম্নরূপ ভাবে তুলো ধরা হয়েছেঃ

১. শিয়া-সুন্নি বিরোধ; মানুষের-সার্বভৌমত্ব বিতর্ক; তুর্কি-ইরানী বিতর্ক; উপজাতি বিতর্ক; এবং মনীষী ও রাষ্ট্রের বিতর্ক;

২. খুব অল্প কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া মুসলমানরা অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত।

৩. আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান এবং বিবেকের অভাব।

৪. তারা সম্পূর্ণভাবে দুনিয়ার সকল ব্যবসা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং পরকালীন সম্পর্কিত বিষয়ের চিন্তা নিয়ে মগ্ন।

৫. সম্রাটরা ক্রুদ্ধ একনায়ক।

৬. রাস্তাসমূহ নরাপদ নয়, পরিবহন এবং ভ্রমণ কদাচিৎ।

৭. মহামারী, বিশেষ করে প্লেগ ও কলেরার বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেই। ফলে প্রতি বছর হাজার হাজার লোক মারা যায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সর্ব ক্ষেত্রে অবহেলা করা হয়।

৮. নগরসমূহে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নেই।

৯. বিদ্রোহী ও সশস্ত্র লোকদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নিতে সমর্থ নয়। সর্বত্র একটি সাধারণ অচলাবস্থা। তাদের গর্বের বিষয় কুরআনের অনুশাসন মোটেই অনুশীলন করা হয় না।

১০. অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, দারিদ্র এবং অধঃপতিত অবস্থা।

১১. তাদের নিয়মতান্ত্রিক সেনাবাহিনী নেই কিংবা তাদের যথেষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র নেই এবং মজুদ অস্ত্রসমূহ গানুগতিক ও ভঙ্গুর।

১২. নারী অধিকার অমান্য।

১৩. পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার অভাব।

মুসলমানদের দুরাবস্থার যে সমস্ত কারণসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে তা উপরোক্ত অনুচ্ছেদসমূহে বিবৃত হয়েছে। এ বইয়ে মুসলমানদের তাদের ধর্ম ইসলামের বিশ্বাসের কারণে তারা বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক শক্তির ক্ষেত্রে এখনো বিস্মৃতিপরায়ণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অতঃপর বইটি ইসলাম সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করছেঃ

১. ইসলাম ঐক্য ও সহযোগিতার নির্দেশ দেয় এবং অনৈক্যকে নিষিদ্ধ করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহর রজ্জু সকলে শক্ত ভাবে ধারণ করো①।"

①সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৩।

২. ইসলাম শিক্ষা ও সচেতন হওয়ার নির্দেশ দেয়। কুরআনে বলা হয়েছে, "পৃথিবীতে ভ্রমণ করো"①।

৩. ইসলাম জ্ঞান আহোরণ করতে বলে। একটি হাদিসে বর্ণীত আছে, "নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জ্ঞান আহোরণ করা ফরয"।

৪. ইসলাম বিশ্বের জন্য কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, "তাদের মধ্যে কয়েকজন বলে, হে আল্লাহ্ আমাদের ইহ জগতে এবং পরজগতে কল্যাণ দান করো ②।"

৫. ইসলাম পরামর্শ করার কথা বলে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "তাদের কার্যসমূহ সম্পাদিত হয়েছে তাদের মধ্যে আলোচনার পর③"।

৬. ইসলামে সড়ক নির্মাণ করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, "মাটির উপর দিয়ে ভ্রমন করো④"।

৭. ইসলাম মুসলমানদের তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বলে। হাদিসে বর্ণিত আছে ঃ জ্ঞানের চারটি অংশ রয়েছে। (১) বিশ্বাসকে ধারণ রাখার জন্য ফিকাহ সম্পর্কে জ্ঞান; (২) স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ওষুধ সম্পর্কে জ্ঞান; (৩) ভাষার জ্ঞানের জন্য আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কে জ্ঞান; (৪) সময় সম্পর্কে সচেতনতার জন্য জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান অর্জন।

৮. ইসলাম উন্নয়নের কথা বলে। কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ পৃথিবীর সকল কিছু তোমার জন্য সৃষ্টি করেছেন⑤।"

৯. ইসলাম সুশৃঙ্খলার নির্দেশনা দেয়। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "সবকিছুই হিসাব নিকাশ এবং শৃঙ্খলার উপর নির্ভরশীল ⑥।"

১০. ইসলাম অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী হওয়ার নির্দেশ দেয়। হাদিসে বর্ণিত আছে ঃ "পৃথিবীতে এমন ভাবে কাজ করো যেন তুমি কোন দিন মৃত্যু হবে না। এবং পরকালের জন্য এমন ভাবে কাজ করো যেন আগামী কাল তোমার মৃত্যু হবে।"

---

①সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৩৭।
②সূরা বাকারা, আয়াত ২০১।
③সূরা শূরা, আয়াত ৩৮।
④সূরা মুলক, আয়াত ১৫।
⑤সূরা বাকারা, আয়াত ২৯।
⑥সূরা হিজরি, আয়াত ১৯।

১১. ইসলাম শক্তিশালী অস্ত্রসম্পন্ন একটি সেনাবহিনী প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশনা দেয়। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ " তাদের বিরুদ্ধে তুমি যত বেশি পার সৈন্য তৈরি করো১।"

১২. ইসলাম নারীর অধিকার এবং তাদের মূল্যায়ন করতে নির্দেশনা দিয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, "নারীর প্রতি পুরুষের যেমন অধিকার তেমনি পুরুষের প্রতিও নারীর অধিকার রয়েছে"২।

১৩. ইসলাম পরিচ্ছন্নতার প্রতি নির্দেশনা দেয়। হাদিসে বর্ণিত আছেঃ "পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।"

এ বইটি মুসলমানদের শক্তির নিম্নোক্ত উৎসসমূহকে ধ্বংশ ও ক্ষতি সাধন করার জন্য সুপারিশ করেছে।

১. ইসলাম বর্ণ, লিঙ্গ, বৈষম্য, ঐতিহ্য, প্রথা এবং জাত্যাভিমানকে বাতিল বলে আক্ষায়িত করেছ।

২. সুদ, ঘুষ, ব্যাভিচার, মদ, ও শূকর নিষিদ্ধ করেছে।

৩. মুসলমানরা তাদের উলেমাদের (ধর্মীয় মনীষী) গভীরভাবে অনুগত।

৪. অধিকাংশ সুন্নি মুসলমান খলিফাকে রাসূলুল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মনে করেন। তাদের বিশ্বাস আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয় তার প্রতিও সেভাবে সম্মান প্রদর্শন করা ফরয।

৫. জিহাদ করা ফরয।

৬. শিয়া মুসলমানদের মতে সকল অমুসলমান ও সুন্নি মুসলমান খারাপ লোক।

৭. সকল মুসলমানের বিশ্বাস ইসলামই হচ্ছে একমাত্র সত্য ধর্ম।

৮. অধিকাংশ মুসলমান বিশ্বাস করে যে, আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিতাড়িত করা ফরয।

৯. তারা তাদের ধর্মীয় ইবাদাতগুলো (যেমন ঃ নামায, রোযা, হজ্জ) অত্যন্ত সুন্দর ভাবে পালন করে।

১০. শিয়া মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, মুসলমানদের দেশে চার্চ নির্মাণ হারাম।

১১. ইসলামী বিশ্বাসের ভিত্তিতে মুসলমানরা রোযা পালন করে।

১সূরা আনফাল, আয়াত ৬০।
২সূরা বাকারা, আয়াত ২২৮।

১২. শিয়া মুসলমানরা এক পঞ্চমাংশ Humus প্রদান করা ফরয মনে করে।

১৩. মুসলমানরা তাদের ছেলে-মেয়েদের এমনভাবে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলে যেন তাদের পূর্ব-পুরুষরা যা অনুসরণ করতো তা ছেড়ে না দেয়।

১৪. কোন দুষ্ট লোকের নজর তার উপর না পড়ে, মুসলমান রমণীরা নিজেদেরকে,- সেভাবে আবৃত করে রাখেন।

১৫. মুসলমানরা জামাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে যা তাদেরকে প্রতি দিন পাঁচ বার একত্রিত করে।

১৬. মুসলমানরা তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ, আলী ও অন্যান্য ধার্মিক লোকজনের সমাধিকে পবিত্র মনে, তারা সে স্থানে সমবেত হয়।

১৭. রাসূলুল্লাহর উত্তরাধিকারীরা (যাদেরকে সৈয়দ ও শরীফ বলা হয়); এ সব সময় নবীকে স্মরণ করেন এবং তাকে অন্য মুসলমানদের চোখে জীবন্ত করে রাখেন।

১৮. যখন মুসলমানরা সমবেত হয় তখন ইমাম ধর্মীয় পবিত্র আচার অনুষ্ঠানে তাদের উদ্বুদ্ধ করেন।

১৯. সৎ কাজের আদেশ প্রদান করা এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করাকে ফরয মনে করে।

২০. পৃথিবীতে মুসলমানের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য একাধিক মহিলাকে বিবাহ করা সুন্নাত।

২১. মুসলমানদের কাছে সারা বিশ্ব দখল করার চেয়েও একজন লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা অনেক বেশি মূল্যবান।

২২. হাদিসে আছে, "কোন লোক যদি অন্য লোককে সঠিক পথ দেখায়, তাহলে ঐ লোকটি সঠিক পথে চলে যে ছওয়ার অর্জন করবেন, তাকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য ওই লোকটিও সমপরিমাণ ছওয়াব পাবেন।" এটা মুসলমানদের মধ্যে পরিচিত।

২৩. মুসলমানরা কুরআন ও হাদিসকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে ধারণ করে। তাদের বিশ্বাস এগুলোই পালন করাই বেহেস্ত অর্জন করার একমাত্র পথ।

মুসলমানদের পঙ্গু করার জন্য তাদের ক্ষত স্থানসমূহকে কাজে লাগানো এবং দুর্বলতাসমূহ তুলে ধরার জন্য এ বইয়ে সুপারিশ করা হয়েছে। এতে নিম্নোক্ত পদক্ষেসমূহ গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছেঃ

১. বিতর্কিত গ্রুপসমূহের মধ্যে শত্রুতা চিরস্থায়ী করার ও অবিশ্বাস তৈরি করার জন্য সন্দেহ বপন করা এবং এ বিতর্ক উস্কে দেয়ার জন্য সাময়িকী প্রকাশ করা।

২. স্কুল ও প্রকাশনাকর্মকে বাধাগ্রস্ত করা এবং যখন সম্ভব হয় বই পুস্তক বা পত্র পত্রিকা পুড়িয়ে ফেলা। ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম কুৎসা রটনা করা যাতে মুসলমান পিতা-মাতাদের তাদের ছেলে-মেয়েদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পাঠানো থেকে বিরত রাখে এবং এভাবে তাদের অজ্ঞ করে রাখা নিশ্চিত করা। *[ব্রিটিশদের এ পদ্ধতি ইসলামের জন্য বেশ ক্ষতির কারণ হয়েছিল]*

৩-৪. তাদের উপস্থিতিতে বেহেস্তের প্রশংসা করা এবং পার্থিব জগতের কাজ কর্ম করার তেমন প্রয়োজন নাই, সে লক্ষ্যে তাদের রাজি করানো। তাসাউফের পরিধিকে বর্ধিত করা। তাদেরকে অসচেতন করে রাখতে হবে এজন্য তাদের এমন বই পুস্তক (Zuhd) পাঠ করতে উৎসাহিত করতে হবে যেমন গাজ্জালী রচিত ইয়াহ্-উল-উলুম-ই-দ্বীন, মাওলানা লিখিত মসনবী এবং মুহিউদ্দিন আরবী লিখিত বিভিন্ন পুস্তক।

৫. সম্রাটকে ক্রুদ্ধতা ও একনায়কতন্ত্রকে উজ্জীবিত করার জন্য জননায়কোচিত বক্তব্য প্রদানে এ বলে রাজি করানো যে, আপনি হচ্ছেন পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া। প্রকৃতপক্ষে আবু বকর, উমর, ওসমান ও আলী, উমাইয়া এবং আব্বাসীয়রা শক্তি ও অস্ত্রের জোরে ক্ষমতা দখল করেন এবং তারা প্রত্যেকেই ছিলেন সার্বভৌম। উদাহরণ হচ্ছে; আবু বকর উমরের তরবারির জোরে ক্ষমতায় আরোহণ করেন এবং তাঁকে যারা অমান্য করেছে তাদের ঘর-বাড়িতে এমনকি ফাতেমার বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করেন এবং উমর খলিফা হন আবু বকরের সমর্থনে। অপরপক্ষে, উমরের আদেশ বলে ওসমান খলিফা নির্বাচিত হন। এদিকে আলী রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচিত হন সমাজচ্যুত লোকজনের মধ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে। মুয়াবিয়া তরবারীর জোরে খলিফা হন। অতঃপর উমাইয়াদের আমলে সার্বভৌমত্ব ঘুরে দাঁড়ায় উত্তারাধিকার হিসেবে এবং তা পৌত্রিকসূত্রে

প্রবাহিত হতে থাকে। একই অবস্থা ছিল আব্বাসীয়দের ক্ষেত্রেও। ইসলামে সার্বভৌম ক্ষমতা কি ভাবে, একনায়কতন্ত্রে রূপ নেয় এ সকল ঘটনাই হচ্ছে তার প্রমাণ।

৬. দণ্ডবিধি আইন থেকে হত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড রহিত করা হয়। [দস্যুতা ও হত্যাকান্ডের একমাত্র প্রতিরোধ হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। নৈরাজ্য ও দস্যুতা মৃত্যুদণ্ড ছাড়া দমন সম্ভব নয়।] ডাকাত ও মহাসড়কের দস্যুদের শাস্তি প্রদান করা থেকে প্রশাসনকে বাধাগ্রস্থ করা। তাদের সমর্থন দেয়া এবং অস্ত্র সরবরাহ করার মাধ্যমে ভ্রমণকে নিরাপত্তাহীন করে তোলা।

৭. নিম্নোক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা তাদের একটি অস্বাস্থ্যকর জীবনের দিকে ঠেলে দিতে পারি। - সকল কিছুই আল্লাহর কৃপার উপর নির্ভরশীল। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে মেডিকেল চিকিৎসার কোন ভূমিকা নেই। আল্লাহ কি কুরআনে বলেননি, "আমার রব আমাকে খাবার এবং পানি সরবরাহ করেন। আমি অসুস্থ হলে তিনি আমাকে সুস্থ করেন। কেবল মাত্র তিনিই আমাকে মেরে ফেলবেন এবং পুনর্জীবন দান করবেন"(১)। তাহলে, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ অসুস্থতা ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

৮. উন্মত্ততাকে উৎসাহিত করার জন্য এভাবে বিবৃতি দিতে হবেঃ - ইসলাম হচ্ছে প্রার্থনা করার ধর্ম। রাষ্ট্রীয় কাজ কর্মে এর কোন আগ্রহ নেই। সে জন্য মুহাম্মদ এবং খলিফাগণের কোন মন্ত্রী অথবা আইন ছিল না।

৯. এবারে যা সুপারিশ করা হয়েছে, এ জাতীয় ক্ষতিকর কাজকর্মের স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে অর্থনৈতিক পতন। আমাদের কাজ হচ্ছে ফসল ধ্বংস করা, বাণিজ্যিক নৌ-বহর ডুবিয়ে দেয়া, বাজার এলাকায় অগ্নি সংযোগ করা, বাঁধ, ব্যারেজ ধ্বংস করে দেয়া, এভাবে কৃষি ও শিল্প কেন্দ্রসমূহ ডুবিয়ে দেয়া এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের খাবার পানির নেটওয়ার্ক দূষিত করে ফেলা।

১০. রাষ্ট্রনায়কদের যৌনতা, খেলাধূলা, মদ, জুয়া ও দুর্নীতিতে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে, যাতে তারা এসব ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যয় করে এবং এগুলো হবে জনবিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের কারণ। সরকারি

কর্মচারীদেরও এসব কাজে অভ্যস্ত হতে উৎসাহ দিতে হবে এবং যারা এসব কাজে আমাদের সহায়তা করবে তাদের পুরস্কৃত করতে হবে।

অতঃপর বইটিতে নিম্নোক্ত পরামর্শ সংযুক্ত করার কথা বলা হয়: ব্রিটিশ গোয়েন্দা যারা এ দায়িত্ব পালন করছে তাদের অবশ্যই প্রকাশ্যে বা গোপনে রক্ষা করতে হবে এবং মুসলমানদের হাতে কেউ বন্দি হলে তাকে যে কোন মূল্যে উদ্ধার করতে হবে।

১১. সকল ধরনের সুদকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। এ সুদ শুধু জাতীয় অর্থনীতিকেই ধ্বংস করে না বরং তা মুসলমানদের কুরআনের বিধানের প্রতি অবাধ্য করে তুলবে। একজন লোক একদিন যদি কোন একটি বিধান অমান্য করে তাহলে তার জন্য অন্য বিধানগুলোও অমান্য করা সহজ হবে। তাদের অবশ্যই বলতে হবে যে, "চক্র বৃদ্ধি হারে সুদ হারাম"। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "চক্র বৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ করো না(১)"। সুতরাং সকল ধরনের সুদ হারাম নয়।

১২. মনীষীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ও কুৎসা রটনা এবং নিষ্ঠুরতার বিস্তার ঘটাতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে নোংরা, মিথ্যা দুর্নাম রটানো হলে মুসলমানরা তাদের নিকট হতে সরে পড়বে। আমরা আমাদের কিছু গোয়েন্দাদেরকে তাদের ছদ্মবেশ ধারণ করাবো। পরে তাদের দিয়ে আমরা এ সকল নোংরা কাজগুলো করাবো। তখন তারা সকল মনীষীদের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়বে এবং প্রত্যেক মনীষীকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করবে। এ গোয়েন্দাদেরকে অবশ্যই আল আজহার, ইস্তাম্বুল নাজাফ ও কারবালায় অনুপ্রবেশ করাতে হবে। মনীষীদের কাছ থেকে মুসলমানদেরকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আমাদের স্কুল, কলেজ খুলতে হবে। এ সব স্কুলে আমরা বাইজেন্টাইন, গ্রিক ও আমেরিকান ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষা দেব এবং তাদেরকে মুসলমানদের শত্রু হিসেবে গড়ে তুলবো।

মুসলমানদের ছেলেমেয়েদের আমরা এই বলে অনুপ্রাণিত করবো যে, তাদের পূর্বপরুষরা ছিল অশিক্ষিত লোক। তাদের খলিফা, মনীষী এবং রাষ্ট্রনায়কদের বিরুদ্ধে এ সব ছেলেমেয়েদের ক্ষেপিয়ে তুলার জন্য তাদের দোষ ক্রটিগুলো তুলে ধরতে হবে। এবং বুঝাতে হবে যে খলিফারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য উপপত্নী নিয়ে আমোদ-ফূর্তিতে সময় ব্যয় করছে, তারা জনগণের সম্পদের অপব্যবহার করছে, তারা নবীকে মান্য করছে না এবং যা কিছু করছে তাতে নবীকেই অমান্য করা হচ্ছে।

১৩. ইসলাম মহিলাদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে এ মিথ্যা অপবাদটি ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমরা এই আয়াতটি উদ্ধৃত করবো ঃ

১৪. "পুরুষদের আধিপত্য মহিলাদের উপর①" এবং এ হাদীসটি বলব যে, "মহিলারা সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিকর"②।

১৫. পানির অভাব অপরিচ্ছন্নতার কারণ। সুতরাং আমরা অবশ্যই বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পানির সরবরাহ বাধাগ্রস্ত করতে থাকবো।

মুসলমানদের সুরক্ষিত বিষয়সমূহ ধ্বংসের জন্য এই বইয়ে নিম্নোক্ত পরামর্শ দেওয়া গেল ঃ

১. মুসলমানদের মধ্যে উগ্র স্বাদেশিকতা যেমন ঃ বর্ণবাদ ও জাতীয়তাবাদ জাগিয়ে তোলার জন্য প্ররোচিত করতে হবে, যাতে তাদের ইসলাম পূর্ব বীরত্বের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। মিসরের ফারাহ যুগ, ইরানের ম্যাগী যুগ, ইরাকের ব্যাবিলনীয় যুগ, ও অটোমানদের আত্তিলা ও ট্রেনজিজ (tyrannisms) যুগকে নতুনভাবে ফিরিয়ে আনার জন্য প্ররোচনা দিতে হবে। (এ বিষয়ের উপর তাদের লম্বা তালিকা রয়েছে।)

২. নিম্নোক্ত মন্দ কাজসমূহ গোপনে বা প্রকাশ্যে করতে হবে ঃ মদ পান, জুয়া খেলা ও শূকর খাওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান এবং ক্রীড়া ক্লাবসমূহে গোলযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
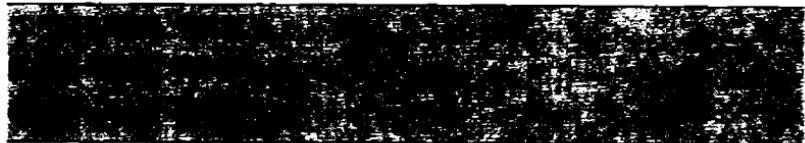
①সূরা নিসা, আয়াত ৩৪।

② [illegible]

এগুলো করার সময় বিভিন্ন মুসলমান দেশে বসবাসরত খ্রিস্টান, ইহুদি, পারসিক ও অন্যান্য অমুসলমানদের ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং যারা এ উদ্দেশ্যে কাজ করবে তাদের কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয়ে অর্থ বিভাগ থেকে উচ্চ হারে বেতন প্রদান এবং পুরস্কৃত করা হবে।

৩. তাদের মধ্যে জেহাদ সম্পর্কে সন্দেহ বপন করতে হবে, তাদের বোঝাতে হবে জিহাদ ছিল একটি সাময়িক নির্দেশ এবং এর উদ্দেশ্য শেষ হয়ে গেছে।

৪. "অবিশ্বাসীরা ঘৃণিত" শিয়াদের মন থেকে এই ধারণাটি মুছে ফেলতে হবে। এ জন্য কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করো ঃ "যাদের উপর আল্লাহর কিতাব নাজিল হয়েছে তাদের খাদ্যও তোমাদের জন্য হালাল। আবার তোমাদের খাদ্যদ্রব্যও তাদের জন্য হালাল(১)" এবং তাদের বলে দাও যে, সাফিয়া নামে এক ইহুদি এবং মারিয়া নামের এক খ্রিস্টান মহিলা নবীর স্ত্রী ছিলেন। এবং কোন ভাবেই নবীর স্ত্রীগণ ঘৃণিত ছিলেন না।

৫. মুসলমানদের এ বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রণিত করো যে, "নবী ইসলাম বলতে যা বুঝিয়েছেন তাই হচ্ছে 'সঠিক ধর্ম' এবং তারপর ইসলামের অনুরূপ ধর্ম হচ্ছে ইহুদি ও খ্রিস্টবাদ। নিম্নোক্ত কারণসমূহের দ্বারা এটাকে সংগতিপূর্ণ করতে হবে; কুরআন সকল ধর্মের অনুসারীদের মুসলমান হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, এটা জোসেফ (ইউসুফ আলাইহিওয়াসাল্লাম) নবীকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, তিনি প্রার্থনা করে বলেছিলেন যে "আমাকে একজন মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দাও"। এবং নবী ইব্রাহিম ও ইসমাইল প্রার্থনা করেছেন, "হে আমাদের রব! তোমার জন্য আমাদের মুসলামান বানাও এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে তোমার জন্য মুসলমান বানাও (২)। "ইয়াকুব নবী তাঁর পুত্রদের বলেছিলেন, কোন অবস্থাতেই মুসলমান না হওয়া ব্যাতীরিকে মৃত্যুবরণ করো না(৩)"।

৬. সব সময় প্রচার করতে থাক যে, মুসলমানদের দেশে গীর্জা নির্মাণ হারাম নয়। কারণ নবী ও তার খলিফাগণ কখনো গীর্জা ধ্বংস করেন নি। উপরোক্ত তারা এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

কারণ কুরআনে বলা হয়েছে, "যদি আল্লাহ মানব জাতীর এক দলকে অন্য দল দিয়ে প্রতিহত না করতেন তাহলে দুনিয়ার বুক থেকে (ইহুদিদের ধর্ম মন্দির) উপাসনালয় ও গির্জাসমূহ ধ্বংস হয়ে যেত (১)"।

৭. সে জন্য ইসলাম মন্দিরকে সম্মান করে এবং ইহা ধ্বংস করে না এবং যদি এগুলো কেউ ধ্বংস করতে চায় তাদের হাত থেকে রক্ষা করে।

৮. এই হাদীসটি সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক করতে হবে যে, "আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদিদের বিতারিত করো", এবং " দুটি ধর্ম একই সাথে আরব উপদ্বীপে সহাবস্থান হতে পারে না", "এ সম্পর্কে বলতে হবে যে, "যদি এ দুটি হাদিস সত্য হতো, তাহলে নবীর ইহুদি পত্নী ও খ্রিস্টান পত্নী থাকতো না। অথবা তিনি নজরানের খ্রিস্টানদের সাথে চুক্তি করতেন না"।

৯. মুসলমানদের প্রার্থনা করার ব্যাপারে অনাগ্রহী করে তুলতে হবে এবং প্রার্থনা করা থেকে তাদের বিরত রাখার জন্য বলতে হবে যে, আল্লাহ বলেছেন, "মানুষের প্রার্থনা আল্লাহ কোন প্রয়োজন নাই"। তাদের হজ্জ পালন করা থেকে বিরত রাখতে হবে। এ ছাড়া এ জাতীয় যে কোন ধরনের প্রার্থনা করা যা তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারে তা থেকেও বিরত রাখতে হবে। একই ভাবে মসজিদ, সমাধি ও মাদ্রাসা নির্মাণ করা এবং কাবা পুনঃস্থাপনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে হবে।

১০. যুদ্ধে শত্রুর নিকট থেকে প্রাপ্ত গণিমাতের মালের এক পঞ্চমাংশ উলামাদের প্রদান করতে হবে এ সম্পর্কে শিয়াদের নিয়মকে হতবুদ্ধি হিসেবে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং এভাবে বলতে হবে যে, দারু-উল-হার্ব থেকে গৃহীত উক্ত গণিমাতের এক পঞ্চমাংশ সম্পদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত সংমিশ্রনে কোন কিছু করা যাবে না। তারপর যোগ কর যে, উক্ত হুমুস (Humus - উপরোল্লিখিত এক পঞ্চমাংশ) নবীকে অথবা খলিফাকে দিতে হবে, উলেমাদেরকে নয়। কারণ উলেমারা, বাড়ি, প্রাসাদ, পশু এবং ফলের বাগান পেয়ে থাকে। সুতরাং তাদের উক্ত গণিমতের এক পঞ্চমাংশ দেয়া বৈধ নয়।

১১. মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে ভিন্নমতের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ইসলামকে সন্ত্রাসের ধর্ম হিসেবে সমালোচনা করতে হবে। মুসলিম দেশসমূহ পশ্চাৎপদ এবং তাদের দুরাবস্থা কবলিত বলে বলে ঘোষণা করতে হবে এবং এভাবে ইসলামের প্রতি তাদের আনুগত্য দুর্বল করে দিতে হবে। *[অপরদিকে মুসলমানরা বিশ্বে সবচেয়ে বড় ও সুসভ্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলামের প্রতি তাদের আনুগত্য কমে যাওয়ার জন্যই তারা অধপাতিত অবস্থা হয়েছে]*

১২. অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঃ পিতার নিকট থেকে ছেলেমেয়েদের পৃথক করতে হবে এবং এভাবে শিশুরা তাদের বড়দের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। আমরা তাদের শিক্ষা প্রদান করব। ফলে যখনই ছেলেমেয়েদেরকে তাদের পিতার শিক্ষা থেকে আলাদা করে ফেলা হবে, তাদের মধ্যে তাদের বিশ্বাস, ধর্ম ও ধর্মীয় মনীষীদের সঙ্গে যোগাযযোগ করার কোন সম্ভাবনা আর থাকবে না।

১৩. মহিলাদের প্রচলিত পর্দা প্রথা থেকে মুক্তির জন্য উত্তেজিত করতে হবে। অপব্যাখ্যা তৈরি করতে হবে যে, "পর্দা সঠিক ইসলামী নির্দেশনা নয়। ইহা আব্বাসীয়দের আমলে প্রতিষ্ঠিত একটা প্রথা। অতীতে নবীর পত্নীগণ ও অন্যান্য রমণীগণ সকল ধরনের সামাজিক কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন"। প্রচলিত প্রথা হিসেবে মহিলাদের এক টুকরা কাপড় দ্বারা আবৃত্ত করার পরে যুবকরা তাদের প্রতি খারাপ দৃষ্টিতে তাকায় ফলে উভয়ের মধ্যে অশ্লীলতার সৃষ্টি হয়। ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য এটি একটি কার্যকর পদ্ধতি। এ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য প্রথমে অমুসলিম রমণীদের ব্যবহার করতে হবে। অতঃপর সময়তো মুসলমান রমণীরা আপনা আপনি পদস্খলিত হবে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।

১৪. জামাতে নামায পড়া বন্ধ করার জন্য সকল সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। এজন্য ইমামদের বিরুদ্ধে মসজিদে মিথ্যা কলঙ্ক রটাতে হবে। তাদের ভুলকে তুলে ধরতে হবে এবং মুসল্লি যারা তার পিছনে প্রতিদিন নামায আদায় করে তাদের মধ্যে ঝগড়া এবং বিরোধিতার বীজ বপন করতে হবে।

১৫. বলতে হবে যে, সকল কবরস্থানগুলো মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে, কারণ নবীর সময় এ ধরনের কিছু ছিল না। অধিকন্তু কবর জিয়ারত

সম্পর্কে বিভিন্ন সন্দেহের সৃষ্টি করে মুসলমানদের মধ্যে নবীদের, খলিফাদের ও ধার্মিক মুসলমানদের কবর জিয়ারতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলতে হবে, নবীকে করব দেওয়া হয়েছে তার মায়ের পাশে, আবু বকর ও উমরকে বাকি (Bâkî') নামক গোরস্থানে কবর দেওয়া হয়েছে। উসমানের কবর কোথায় জানা যায়নি। হুসেনের মস্তক কবর দেওয়া হয়েছে হানানন্না নামক স্থানে। তাঁর দেহ কোথায় কবর দেওয়া হয়েছে তা জানা যায় নি। কাজিমিয়ার কবরস্থানে দুজন খলিফাকে কবর দেয়া হয়েছে। তারা নবীর দুই উত্তরাধিকারী কাজিম ও জাওয়াদের সাথে সম্পর্কিত নন। তুস (নগরী) -এর এক কবরস্থানে রয়েছে হারুনের কবর, সেখানে আহল-আল বায়াত (নবীর পরিবার) এর সদস্য রিজার কবর নয়। সামেরার কবরসমূহ হচ্ছে আব্বাসীয়দের। তারা আহল-আল-বায়াত হাদি, আশকরি ও মহোদীর সদস্য নন। মুসলিম দেশে সকল সমাধি ও গম্বুজ গুড়িয়ে দেয়া যেমন ফরয তেমনি বাকি (Bâkî') নামক গোরস্থান বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেয়া অত্যবশ্যক।

১৬. সৈয়দগণ নবীর উত্তরাধিকার এ সত্য সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে হবে। সৈয়দ এবং অন্য লোকদের মিশিয়ে ফেলতে হবে, এজন্য সৈয়দদের মতো অন্য লোকদেরকে কালো এবং সবুজ পাগড়ি পরিধান করাতে হবে। এভাবে সৈয়দদের বিষয়ে মানুষ জট পাকিয়ে ফেলবে, ফলে মানুষেরা তাদের সন্দেহ করতে শুরু করবে। ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ ও সৈয়দদের তাদের পাগড়ির বিষয় সম্পর্কে উন্মোচন করে দিতে হবে, ফলে তাদের নবী বংশে হারিয়ে যাবে এবং ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ আর কখনো সম্মান পাবে না।

১৭. বলতে হবে যে, শিয়াদের সকল শহীদস্থান ধ্বংস করে ফেলা ফরয। কারণ এ সকল চর্চা হচ্ছে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে বিপথগামী হওয়া। মানুষকে এ সব স্থান পরিদর্শনে বাধা দিতে হবে, শহীদী স্থানসমূহের মালিকদের এবং ধর্ম প্রচারকদের উপর কর আরোপ করতে হবে তা হলে ধর্ম প্রচারকদের সংখ্যা কমে আসবে।

১৮. ভালবাসা ও স্বাধীনতার ছলে সকল মুসলমানকে বিশ্বাস করাতে হবে যে, "প্রত্যেকেই স্বাধীন এবং যা ইচ্ছা তা করতে পারে। "সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং অন্যায় কাজের নিষেধ করা" কিংবা ইসলামী নীতিমালা শিক্ষা

দেওয়া ফরয নহে।" *[অপরপক্ষে বিদ্যা অর্জন ও ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া ফরয। এটা মুসলমানদের জন্য প্রথম কাজ।]* অধিকন্তু তাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস অনুপ্রাণিত কর যে, খ্রিস্টানরা তাদের এই নিজস্ব বিশ্বাসের (খ্রিস্টবাদ) উপর রয়েছে এবং ইহুদিরা তাদের এই ইহুদিবাদ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। কেউ অন্য কারো হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে না। সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং অন্যায় কাজের নিষেধ করা (আমর-ই-বাই-ইল-মারুফ ও নাহে-ই-আনিল-মুনকার) হচ্ছে খলিফাদের কর্তব্য।

১৯. ক্রমবর্ধমান মুসলমানদের সংখ্যা কমানোর জন্য অবশ্যই জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং এর জন্য বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে বিয়ের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ এটা অবশ্যই বলা যায় যে, একজন আরব একজন ইরানীকে বিয়ে করতে পারবে না, একজন ইরানী একজন আরবকে বিয়ে করতে পারবে না এবং একজন তুর্কি একজন আরবকে বিয়ে করতে পারবে না।

২০. ইসলামী প্রচার এবং অনুবাদ অবশ্যই বন্ধ করার বিষয় নিশ্চিত হতে হবে। এ অভিমত প্রচার করতে হবে যে, ইসলাম হচ্ছে কেবলমাত্র আরবদের নিজস্ব ধর্ম। এর প্রমাণ স্বরূপ কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করতে হবে, বলা হয়েছে- "এ দ্বারা তুমি মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী জনপদের মানুষদের সতর্ক করতে পারবে"[১]।

২১. "ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অবশ্যই বিধি নিষেধ থাকবে এবং রাষ্ট্র কর্তৃক একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। কোন ব্যক্তি বিশেষ মাদ্রাসা বা এ জাতীয় অন্য কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে সমর্থ হবে না"।

২২. কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে মুসলমানদের মনে সন্দেহ জাগরিত করা, কিছু কিছু বাদ দিয়ে কুরআনের অনুবাদ করা, পরিবর্ধন করা, মেকী রচনা করতে হবে এবং বলতে হবে, "কুরআনকে বিকৃত করা হয়েছে। এর কপিসমূহের মধ্যে মিল নাই। একটির সাথে অন্যটির আয়াতের কোন মিল নেই"। যে সকল আয়াতে ইহুদি, খ্রিস্টান ও অন্যান্য অমুসলিমদের তিরস্কার করা হয়েছে এবং জেহাদের আয়াতসমূহ, সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা (আমর-ই-বাই-ইল-মারুফ ও নাহে-

---

[১] সূরা ৬:৯২ বা ৪২:৭।

ই-আনিল-মুনকার) বাদ দিতে হবে। কুরআনকে অন্য ভাষা যেমন তুর্কি, ফারসি ও ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করতে হবে। এভাবে আরবের দেশের বাইরের লোকদেরকে আরবী ভাষা শিক্ষা থেকে বিরত রাখতে হবে এবং এরপর আরব দেশের বাইরে আরবীতে আযান, নামায ও দোয়া করা প্রতিরোধ করতে হবে। একইভাবে, হাদীস সম্পর্কেও মুসলানদের মনে সন্দেহ তৈরি করতে হবে। কুরআনের ক্ষেত্রে অনুবাদ, সমালোচনা ও মেকী রচনার পরিকল্পনা করা হয়েছে তা হাদীসের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে হবে।

'আমরা কিভাবে ইসলামকে ধ্বংস করতে পারি' (How Can We Demolish Islam) শিরোনামের অধ্যায়টি আমি পাঠ করে চমৎকৃত হই। এটা হচ্ছে অধ্যয়ন করার মতো একটি অদ্বিতীয় নির্দেশনা, যা আমি বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি। বইটি যখন আমি সেক্রেটারীর কাছে ফেরত দিলাম তাকে বললাম যে, বইটি আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে। তিনি বললেন, তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো যে, এই কাজে এখন তুমি একা নও। তুমি যে কাজ করতে যাচ্ছ তা করার জন্য আরো অনেক লোক নিয়োজিত রয়েছে। আমাদের মন্ত্রণালয় এ মিশনে পাঁচ হাজার লোক নিযুক্ত করেছে। মন্ত্রণালয় এ সংখ্যা এক লাখে উন্নীত করার কথা বিবেচনা করছে। যখন আমরা এই সংখ্যায় উন্নীত হতে পারব, তখন সকল মুসলমান আমাদের কর্তৃত্বের আওতায় চলে আসবে এবং সব মুসলিম দেশ আমাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।"
কিছুক্ষণ পর সেক্রেটারী বললেন, "তোমার জন্য শুভ সংবাদ। আমাদের মন্ত্রণালয়ের এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ এক শতাব্দী সময় লাগবে। আমরা হয়ত সে সুখী দিনগুলো দেখার জন্য বেঁচে থাকবো না, কিন্তু আমাদের ছেলে-মেয়েরা থাকবে। কি চমৎকার কথা; "আমরা যে ফল খাচ্ছি তা অন্যরা বপন করেছিল। সুতরাং আমাদেরকে অন্যদের জন্য বপন করতে হবে। যখন ব্রিটিশরা এটা সংগঠিত করতে পারবে তখন তারা সমগ্র খ্রিস্টান জগতকে খুশি করতে পারবে এবং তাদের ১২ (বার) শতাব্দীর পুরনো যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা পাবে।"

সেক্রেটারী নিম্নোক্ত কথাগুলো বলে চললেন, "শত বছর ধরে চলমান ধর্মযুদ্ধে কোন লাভ হয়নি। কিংবা মোঙ্গলরাও (চেঙ্গিসের সেনাদল) বলতে পারো ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য কিছু করতে পারে নাই। তাদের কাজ ছিল আকস্মিক, পদ্ধতি

বিচ্যুত এবং ভিত্তিহীন। তারা তাদের শত্রুতা দমনে যেন সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছে মাত্র। ফলে অল্প সময় পরেই তারা পরিশ্রান্ত হয়ে পরে। কিন্তু এখন আমাদের বিজ্ঞ প্রশাসকরা দীর্ঘমেয়াদী ধৈর্য এবং একটি উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়ে ইসলামকে ধ্বংসের জন্য চেষ্টা করছেন। আমরা অবশ্যই সামরিক শক্তিও প্রয়োগ করবো। যদিও এটা হচ্ছে একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে অর্থাৎ যখন আমরা ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে শেষ করে ফেলতে পারব। পরে আমরা সকল দিক থেকে আঘাত করবো এবং একে এমন এক দেশে পাঠাবো যেখান থেকে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আর কখনো পুনরুজ্জীবিত হতে পারবে না।"

সচিবের শেষ কথা ছিল ঃ ইস্তাম্বুলে আমাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অত্যন্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। তারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছেন। তারা কি করছেন? তারা মুসলমানদের সঙ্গে মিলে মিশে তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য মাদ্রাসা খুলেছেন। তারা গীর্জা নির্মাণ করেছেন। তারা অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে মদ, জুয়া ও অশ্লীলতাকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন এবং মুসলমানদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে শুরু করেছেন। তারা মুসলমান যুবকদের মনে সন্দেহবাদ ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তারা ওদের সরকারের মধ্যে বিতর্ক এবং বিরোধিতার সূত্রপাত করছেন। তারা সর্বত্র খারাপ কাজগুলোকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। তারা প্রশাসক, পরিচালক ও রাষ্ট্রনায়কদের বাসভবন খ্রিস্টান রমণীদের দিয়ে ভরে ফেলে তাদের অধঃপতিত করছেন। এসব কার্যক্রম দ্বারা তারা তাদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছে, তাদের আনুগত্যে চিড় ধরিয়েছে, তাদের নৈতিকভাবে দুনীর্তিপরায়ণ করেছে এবং একতা ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এমন সময় এসেছে একটি অতর্কিত যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে ইসলামের সমাপ্তি সাধন করা।

প্রথম অংশ

সপ্তম অনুচ্ছেদ

প্রথম গোপন কর্মসূচীর বিষয়ে জানার পরে আমি দ্বিতীয় কর্মসূচী জানার জন্য উৎগ্রীব ছিলাম। অবশেষে একদিন সচিব তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দ্বিতীয় গোপন কর্মসূচী ব্যাখ্যা করলেন। এটি ছিল পঞ্চাশ পৃষ্ঠার একটি সর্মসূচী। যাতে এ শতাব্দীর মধ্যেই ইসলামের মূল উৎপাঠন করা যায়, সে লক্ষ্যে এটি মন্ত্রণালয়ে কর্মরত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জন্য প্রণীত হয়েছে। কর্মসূচীটিতে রয়েছে চৌদ্দটি অনুচ্ছেদ। মুসলমানরা যাতে জানতে না পারে সে জন্য এ কর্মসূচীটির ব্যাপারে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। এ কর্মসূচীতে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদগুলো রয়েছে।

১। আমাদেরকে বুখারা, তাজাকিস্তান, আরমেনিয়া, খোরাশান এবং তার প্রতিবেশী অঞ্চলসমূহ অধিকার করার জন্য রাশিয়ান টিএসআর সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত জোট গঠন করতে হবে এবং পারস্পরিক সহায়তার জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে হবে। রাশিয়ানদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র তুর্কিস্থান দখল করার জন্যও তাদের সাথে যথাযথ চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

২। এখান থেকে কিংবা অন্য স্থান থেকেও ইসলামিক বিশ্ব ধ্বংস করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই ফ্রান্সের সাথে সহায়তা করতে হবে।

৩। আমরা অবশ্য তুর্কি এবং ইরানী সরকারের মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য এবং বিতর্কের বীজ বপন করব এবং উভয় পক্ষের মধ্যে জাতীয়তাবাদী, জাতীয়গোষ্ঠীগত ধারণার প্রতি গুরুত্ব তৈরি করবে। এ ছাড়াও সকল মুসলিম গোত্র, জাতি এবং এদের প্রতিবেশী দেশসমূহকে অবশ্যই একে অন্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে হবে। যেগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে সেগুলোসহ সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়কে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে এবং এ সম্প্রদায়গুলোকে একে অন্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে হবে।

৪। মুসলিম দেশের অংশগুলোকে অমুসলিম সম্প্রদায়ের হাতে সমর্পণ করতে হবে। উদাহরণসরূপ মদিনা অবশ্যই ইহুদীদের কাছে, আলেকজান্দ্রীয়া খ্রিস্টানদের হাতে, ইমারা সাইবাদের কাছে, কেরমানশাহ নুশারিয়া গ্রুপের

কাছে যারা আলীকে বিভক্ত করেছে, মাসুল ইয়াজিদীদের কাছে, ইরানিয়ান গলফ্ হিন্দুদের হাতে, ত্রিপলী ড্রুজদের কাছে, কার্স আলউসদের কাছে, মাসকাট খারাজী গ্রুপের কাছে সমর্পণ করতে হবে। পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে এসকল গ্রুপের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে হবে ফলে এর প্রতিটি গ্রুপ হবে ইসলামের গায়ের কাটাস্বরূপ। ইসলামের বিনাশ বা ধ্বংস না হাওয়া পর্যন্ত এর আওতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৫। মুসলমান এবং উসমানিয়া খিলাফত যত সম্ভব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় রাষ্ট্রে বিভক্ত করার জন্য অবশ্যই একটি সিডিউল তৈরি করতে হবে এবং যেন রাষ্ট্রগুলো পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকে। বর্তমানের ভারতবর্ষ হচ্ছে এর একটি উদাহরণ। এজন্য সাধারণ নিয়ম হচ্ছে "ভেঙ্গে ফেল ও প্রভুত্ব কায়েম কর" এবং "ভেঙ্গে ফেল ও গুড়িয়ে দাও"

৬। ইসলামিক সত্তাকে কলুষিত করা জন্য বিভিন্ন মেকী রচনা এবং ধর্মীয় সম্প্রদায় তৈরি করা জরুরী। আমাদিগকে অবশ্যই অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যে, আমরা যে নতুন ধর্মমতটি তৈরি করতে যাচ্ছি তা ইন্দ্রিয় তৃপ্তিদায়ক হয় এবং যারা প্রচার করবে তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হিসেবে তৈরি করতে হবে। শিয়া অধ্যুসিত অঞ্চলে চারটি আলাদা আলাদা ধর্মমত তৈরি করতে হবে। ১. একটি ধর্মমত হযরত হোসাইনকে বিভক্ত করবে, ২. একটি ধর্মমত জাফর সাদিককে বিভক্ত করবে, ৩. একটি ধর্মমত ইমাম মাহদী (আঃ) বিভক্ত করবে ও ৪. একটি ধর্মমত হযরত আলী রিদাকে বিভক্ত করবে। প্রথমটি কারবালার জন্য প্রযোজ্য, দ্বিতীয়টির জন্য ইসফাহান, তৃতীয়টির জন্য সামারা এবং চতুর্থটির জন্য খোরাশান। এ সময়ে আমরা অবশ্যই বর্তমান চারটি সুন্নি মাযহাবকে লক্ষ্য বিচ্যুত করে চারটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্মে প্রতিষ্ঠা করব তুলে ধরব। এটা করার পরে আমরা নাজাদে একটি সর্বোপরি নতুন ইসলামিক সম্প্রদায় তৈরি করব এবং এসকল গ্রুপের মধ্যে একটি রক্তক্ষয়ী ধারা তৈরি করার জন্য প্ররোচিত করবো। আমরা চার মাযহাবের বইগুলোকে ধ্বংস করব, যেন এদের প্রতিটি গ্রুপ তাদের নিজদেরকেই একমাত্র খাটি মুসলমান হিসেবে মনে করে এবং অন্যদেরকে ঘায়েল করবে।

৭। মুসলমান সমাজের মধ্যে অপকর্ম এবং বিদ্বেষ যেমন ব্যভিচার, মাতলামী, জুয়া ইত্যাদির বীজ ছড়াতে হবে। দেশে বসবাসরত অমুসলিমদের এ উদ্দেশ্যে

ব্যবহার করা হবে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য সেনাবাহিনীর মধ্য থেকে ভয়ংকর প্রকৃতির লোকদের সংগ্রহ করতে হবে।

৮। মুসলমান দেশে দুধর্ষ নেতা এবং নির্দয় কমান্ডারদের আমরা প্রশিক্ষণ প্রদান করব। আমরা তাদের ক্ষমতায় আনয়ন করা এবং শারিআর নির্দেশ পালন করা থেকে বিরত রাখার আইন প্রণয়ন করার চেষ্টায় কোন ক্রটি করব না। আমরা তাদের এমনভাবে ব্যবহার করব যেন কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয় থেকে যা করতে বলা হয় তা করার জন্য তারা সদা অনুগত থাকে। তাদের মাধ্যমে আমরা আমাদের ইচ্ছেগুলো প্রচলিত আইনের মাধ্যমে মুসলমান এবং মুসলিম দেশে আরোপ করতে সমর্থ হব। আমরা এমন এক সামাজিক জীবন ব্যবস্থা এবং পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করব যেখানে ইসলামী শরিআর আইন-কানুন পালন করাকে অন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখা হবে এবং ইবাদাত করা হবে অনঅগ্রসর কাজের শামিল। অ-মুসলিমদের মধ্য থেকে তাদের নেতা নির্বাচন করার জন্য কৌশল অবলম্বন করব। এটা করার জন্য আমাদের কতিপয় এজেন্টকে ইসলামিক অথরিটির ছদ্মবেশে রাখতে হবে এবং তাদের উচ্চ পদে আসীন করাতে হবে যাতে তারা আমাদের এ ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করতে পারে।

৯। আরবী ভাষা শিক্ষা বন্ধ করার জন্য সব কিছু করতে হবে। আরবী ব্যতীত অন্য ভাষা যেমন-পার্শি, কুর্দী, পশতু এগুলো জনপ্রিয় করতে হবে। আরব দেশসমূহে বিদেশী ভাষার প্রচলন করতে হবে এবং শিক্ষার মূল উৎপাদন করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর যে ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে এবং সাহিত্য ও বাগ্মিতা ধ্বংস করার জন্য আঞ্চলিক ভাষাকে জনপ্রিয় করতে হবে।

১০। আমাদের লোকজনকে সরকারী উচ্চ পদস্থ লোকদের কাছে বসাতে হবে এবং ধীরে ধীরে যাতে আমরা তাদেরকে সহকারী হিসাবে উন্নীত করব এবং তাদের মাধ্যমে কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয়ের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করব। দাস ব্যবসার মাধ্যমে তা সহজেই করা যায়। প্রথমে আমরা গোয়েন্দাদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেব এবং দাস বা উপ-পত্নীর ছদ্মআবরণে তাদেরকে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা বা তার নিকট আত্মীয় যেমন তাদের ছেলেমেয়ে তাদের স্ত্রী অথবা তারা যাকে পছন্দ করে বা শ্রদ্ধা করে তাদের কাছে বিক্রয় করব। বিক্রয় করার পরে এসকল স্ত্রী দাসেরা পর্যায় ক্রমে সরকারী পদস্থ কর্মকর্তাদের নিকটবর্তী

হতে থাকবে। কখনো তাদের মায়ের ভূমিকায় বা কখনো গৃহ শিক্ষিকার ভূমিকায় তারা মুসলিম সরকারী কর্মকর্তাদের হাতের শাখার মতো ঘিরে থাকবে।

১১। মিশনারীর আওতা আরো বৃদ্ধি করতে হবে যেন তা সমাজের সকল শ্রেণীর পেশা বিশেষত চিকিৎসা পেশা, প্রকৌশল, হিসাব-রক্ষক ইত্যাদির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। আমরা অবশ্য এ সকল নামে যেমন চার্চ, স্কুল, হাসপাতাল, লাইব্রেরী দাতব্য প্রতিষ্ঠানের নামে মুসলমানদের দেশসমূহের নিকট এবং দূরবর্তী স্থানসমূহে প্রচার এবং প্রকাশনা কেন্দ্র খুলব। আমরা খ্রিস্টবাদ সম্পর্কিত লক্ষ লক্ষ বই বিনা মূল্যে বিতরণ করব। অবশ্যই ইসলামের ইতিহাসের সাথে মিল রেখে খ্রিস্টানদের ইতিহাস এবং আন্তঃসরকারী আইন প্রকাশ করব। আমরা অবশ্য সন্নাসী এবং সন্নাসিনির ছদ্মবেশে আমাদের গুপ্তচরদের গীর্জা এবং আশ্রমে অবস্থান করাবো। আমরা তাদের খ্রিস্টান আন্দোলনের নেতা হিসেবে ব্যবহার করব। এরা একই সাথে ইসলামিক বিশ্বের সকল চাঞ্চল্য এবং কর্মধারা সনাক্ত করবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে আমাদেরকে অবহিত করবে। আমরা অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, গবেষক এসকল নামে একটি সেনা সংস্থা তৈরি করব। তারা মুসলমানদের সকল ঘটনা, তাদের পদ্ধতি, আচরণ এবং ধর্মীয় নিয়মকানুন সম্পর্কে অবহিত হবে এবং তাদের ইতিহাসের ভিন্ন অপব্যাখ্যা প্রদান করবে এবং কলুষিত করবে। তাদের সকল বই পুস্তক ধ্বংস করবে এবং ইসলামিক মূল্যবোধ নষ্ট করবে।

১২। আমরা অবশ্যই ইসলামিক যুবক, ছেলে এবং মেয়েদের মন এমন ভাবে বিভ্রান্ত করব যাতে ইসলামের প্রতি তাদের মনে সন্দেহ এবং ইতস্ততার উদ্রেক তৈরি করে। আমরা ইস্‌কুল, বই, পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, খেলাধুলা, ক্লাব, প্রকাশনা, চলচিত্র, টেলিভিশন এবং এ কাজের জন্য আমাদের নিজস্ব প্রশিক্ষিত এজেন্ট দ্বারা একে একে তাদের নৈতিক মূল্যবোধ অপহরণ করব। এটা করার পূর্বশর্ত হচ্ছে যে একটি গোপন সম্প্রদায় তৈরি করতে হবে যারা ইহুদি, খ্রিস্টান এবং অন্য অমুসলিম যুবকদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করবে এবং তাদের দ্বারা মুসলিম যুবক যুবতীদের ফাঁদে ফেলার জন্য প্রলুব্ধ করবে।

১৩। গণঅভ্যুত্থান ও গৃহ যুদ্ধের জন্য উস্কানী দেতে হবে। মুসলামানরা অবশ্যই সব সময় নিজেরা এবং অমুসলিমদের সাথে দাঙ্গা হাঙ্গামায় লিপ্ত থাকবে। এভাবে তাদের শক্তির অপচয় ঘটবে এবং তাদের পক্ষে উন্নতি করা এবং একতা বদ্ধ হওয়া অসম্ভব হবে। তাদের মানসিক অন্তর্নিহিত শক্তি এবং আর্থিক উৎস বিনাশ করতে হবে। ফলে যুবক এবং সক্রিয় লোকজনকে তাদের কর্ম থেকে দূরে সরাতে হবে। তাদের প্রথা বা রীতিনীতিকে অবশ্যই সন্ত্রাস এবং নৈরাজ্য পরিণত করতে হবে।

১৪। সকল ক্ষেত্রে তাদের অর্থনীতি ধ্বংস করে দিতে হবে। তাদের আয়ের উৎস এবং কৃষি জমি বিনষ্ট করতে হবে, তাদের সেচ ব্যবস্থা বিধ্বস্ত করতে হবে এবং নদী শুকিয়ে ফেলতে হবে। মানুষদেরকে এমনভাবে তৈরি করতে যেন তারা নামায আদায় করা এবং কাজ করাকে ঘৃণা করে এবং আলস্য বা কুউরামি যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে দিতে হবে। অলস লোকদের জন্য খেলার মাঠ উন্মুক্ত করে দিতে হবে। নেশা এবং মাদক দ্রব্য সহজ লভ্য করতে হবে।

[উপরের আলোচ্য অনুচ্ছেদগুলো ম্যাপ, ছবি এবং চার্ট দ্বারা পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করা ছিল] এ চমৎকার ডকুমেন্টটির একটি কপি আমাকে দেয়ার জন্য আমি সেক্রেটারিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম।

একমাস লন্ডনে থাকার পরে মন্ত্রণালয় থেকে একটি ম্যাসেজ পেলাম, তাতে ইরাকের নাজাদে মোহাম্মদ ওয়াহাবের সাথে আবার দেখা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যখন আমি আমার মিশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম সেক্রেটারী বলল, "নাজাদের মোহাম্মদ ওয়াহাবের ব্যাপারে কখনো হেলা করো না। এখন পর্যন্ত আমাদের অন্যান্য গুপ্তচর যে সকল রিপোর্ট প্রদান করছে তাতে বোঝা যাচ্ছে নাজাদের মোহাম্মদ ওয়াহাব একটি বোকা জাতীয় লোক, সে আমাদের উদ্দ্যেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য খুব উপযোগী।"

"খোলাখুলিভাবে নাজাদের মুহাম্মদের ওয়াহাবের সাথে কথা বল। আমাদের এজেন্টরা ইসফাহানে খোলাখুলি ভাবে তার সাথে কথা বলেছে এবং সে আমাদের ইচ্ছেগুলোকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেছে। তার শর্তগুলো হচ্ছে আদর্শ এবং মতামত প্রচার করার পরে রাষ্ট্র এবং পণ্ডিতগণ অবশ্যই তাকে আক্রমণ করবে, তা থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ এবং অস্ত্র দ্বারা সমর্থন যোগাতে হবে।

একটি নৃপতির শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে, হতে পারে তা ক্ষুদ্র। মন্ত্রণালয় তার শর্তে সম্মত হয়েছে।"

এ সংবাদ শুনার পরে আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি আনন্দে উড়ছি। আমি সেক্রেটারীকে জিজ্ঞেস করলাম এ সম্পর্কে আমাকে কি করতে হবে। তার জবাব ছিল নাজাদের মুহাম্মদ ওয়াহাব কর্তৃক বাস্তবায়ন করানোর জন্য মন্ত্রণালয় একটি সূক্ষ্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তা নিম্নরূপ:

১। সে অন্য সকল মুসলমানদের কাফের ঘোষণা করবে এবং তাদের হত্যা করা, তাদের সম্পদ দখল করা, তাদের সতীত্ব হরণ করা, তাদেরকে দাসে পরিণত করা, তাদের মহিলাদের উপপত্নী হিসেবে ব্যবহার করা এবং তাদেরকে দাস হিসেবে বাজারে বিক্রয় করার কথা প্রচার করবে।

২। সে প্রচার করবে যে, কাবা হচ্ছে একটি প্রতিমূর্তি এবং ইহা অবশ্যই ভেঙ্গে ফেলতে হবে। হজ্জ করা থেকে বিরত রাখার জন্য বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা হাজীদের দলকে আক্রমণ করবে এবং তাদের জিনিসপত্র কেড়ে নিবে এবং তাদের হত্যা করবে।

৩। উপদেশ প্রদানের দ্বারা খলিফার অনুগত না হওয়ার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য প্রচারণা করবে। এ উদ্দেশ্যে সে সৈন্যদল গঠন করার জন্য প্রস্তুতি নিবে। সে হেজাজের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সকল সুযোগ ব্যবহার করবে।

৪। সে যুক্তি উত্থাপন করবে যে, মুসলমান দেশসমূহে সমাধিক্ষেত্র, গম্বুজ এবং পবিত্র স্থানসমূহ এগুলো হচ্ছে বহুদেবদেবীয় প্রতিক বহন করে, তাই এগুলো ধ্বংস করে ফেলতে হবে। সে নবী(সঃ) তাঁর খলিফাগণ এবং মাজহাবের প্রখ্যাত মনীষীগণের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করার জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করবে।

৫। সে মুসলিম দেশসমূহে বিদ্রেহ, নিপীড়ন, নৈরাজ্য সৃষ্টির উৎসাহ প্রদান করার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করে করবে।

৬। সে মেকী রচনা সম্বলিত কুরআনের একটি কপি এবং হাদিসের কপি তৈরি করার চেষ্টা করবে।

এ ছয় অনুচ্ছেদ সম্বলিত কর্মসূচী ব্যাখ্যা করার পরে সেক্রেটারী আরো উল্লেখ করলেন। এ বিশাল কর্মসূচী নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ো না। কারণ আমাদের কাজ হচ্ছে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য বীজ বপন করা। পরবর্তী প্রজন্ম এ কাজ শেষ করবে। ব্রিটিশ সরকার ধৈর্যের সাথে একের পর এক অগ্রসর হওয়ায় লক্ষ্যে এটি প্রণয়ন করেছে। ইসলামী বিপ্লবের রূপকার মুহাম্মদ(সঃ) কি একজন রক্ত মাংসের মানুষ ছিলেন না? এবং নাজাদের মুহাম্মদ আমাদের বিপ্লব সাধনে তাঁর নবীর মতো আমাদের কাছেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

কয়েকদিন পর, আমি মন্ত্রী, সেক্রেটারী, আমার পরিবার এবং বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বসরার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আমার ছোট ছেলে বলল, "ড্যাডি, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো"। আমার চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠল। আমি আমার দুঃখ আমার স্ত্রীর কাছ থেকেও লুকাতে পারলাম না। এক ক্লান্তিকর ভ্রমণের পর রাতে আমি বসরা পৌঁছলাম। আমি আবদ-উর-রেজার বাড়িতে গেলাম। তিনি ঘুমাচ্ছিলেন। ঘুম থেকে জেগে তিনি আমাকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি আমাকে উষ্ণ আতিথেয়তা করলেন। আমি সেখানে রাত্রিযাপন করলাম। পরের দিন সকালে সে আমাকে বলল "নাজাদের মোহাম্মদ তোমাকে খুঁজেছে, তোমার জন্য একটি চিঠি রেখে গেছে।" আমি চিঠিটি খুললাম। সে লিখেছে যে, সে তার দেশ নাজাদে যাচ্ছে এবং চিঠিতে ঠিকানা দিয়েছে। আমি তাৎক্ষণাত নাজাদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। একটি দীর্ঘ কষ্টকর ভ্রমণের পরে আমি নাজাদ পৌঁছালাম। আমি নাজাদের মুহাম্মদকে তার ঘরেই পেলাম। সে অনেক কৃষকায় হয়ে গেছে। তার এ সম্পর্কে আমি কিছুই বললাম না। পরে জানতে পারলাম সে বিয়ে করেছে।

আমরা নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সে অন্য লোকদের বলবে যে আমি তার দাস, আমাকে অন্য কোথাও পাঠানো হয়েছিল সেখান থেকে ফিরে এসেছি। সে আমাকে এভাবে পরিচয় দিত।

আমি নাজাদের মোহাম্মদের সাথে দু বছর ছিলাম। আমরা তার মতবাদ প্রচার করার জন্য একটি কর্মসূচী তৈরি করলাম। পরিশেষে আমি তার প্রস্তাবসমূহ ১১৪৩ হিজরীতে (১৭৩০ সন) প্রয়োগ করি। তখন সে তার আশেপাশে লোকজন থেকে সমর্থক তৈরি করে। যারা তার ঘনিষ্টজনদের কাছে তার মতামত প্রচার করে। তারপর দিন দিন তার আহ্বান বৃদ্ধি করতে থাকে। শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমি তার জন্য প্রহরীর ব্যবস্থা করি। আমি তাদের চাহিদার চেয়েও বেশি পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ প্রদান করি। যখনই নাজাদের মুহাম্মদকে কোন শত্রু তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হতো আমি তখন প্রহরীদের সাহস যোগাতাম এবং অনুপ্রাণীত করতাম। তার আহ্বান ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পরার পর তার বিরুধীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। কখনো কখনো সে তার আহ্বান ছেড়ে দিতে চাইত, বিশেষ করে যখন সে বহু লোকের আক্রমণের শিকার হতো। তথাপি আমি কখনো তাকে একা ছেড়ে দেইনি এবং সব সময় তাকে সাহস যোগাতাম। আমি তাকে বলতাম যে "মুহাম্মদ নবী (সঃ) তোমার চেয়ে অনেক বেশি নির্যাতন সহ্য করেছেন। তুমি জান, এটাই হচ্ছে সম্মানের পথ। অন্য যে কোন বিপ্লবীর মতো তোমাকেও কিছুটা কষ্ট ভোগ করতে হবে।"

যে কোন সময় শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল। তাই আমি তার বিরোধীদের উপর নজরদারী করার জন্য কতিপয় গোয়েন্দা ভাড়া করলাম। যখনই তার শত্রুরা তার ক্ষতি করতে চাইতো, গোয়েন্দারা আমাকে জানাতো, যাতে আমি তাদের ক্ষতি করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারি। একবার আমাকে জানানো হলো যে, শত্রুরা তাকে হত্যা করবে। আমি সাথে সাথে তাদের প্রস্তুতি নস্যাৎ করার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করলাম। যখন (নাজাদের মোহাম্মাদের সমর্থকরা) তাদের শত্রুদের হত্যা পরিকল্পনার কথা জানতে পারল, তখন থেকে তারা তাদের আরো অধিক ঘৃণা করতে শুরু করল। তারা তাদের ফাঁদে পতিত হল।

নাজাদের মোহাম্মদ আমাকে উক্ত ছয়টি কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলল; কিছুদিনের জন্য আমি এগুলো আংশিকভাবে বাস্তবায়ন করব তার এ কথা যথাযথ ছিল। এ সময় তার পক্ষে সবগুলো কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা অসম্ভব ছিল।

কাবাগৃহ ধ্বংস করা তার পক্ষে অসম্ভব মনে হলো। এবং কাবা গৃহকে দিব্যমূর্তি হিসেবে প্রচার করা প্রত্যাহার করল। অধিকন্তু কুরআনের মেকী কপি প্রকাশ করতে ও সে অস্বীকার করল। এ ব্যাপারে তার সবচেয়ে বেশি ভয় মক্কা শরীফ এবং ইস্ত াম্বুল সরকারকে। সে আমাকে বলল যে এদুটি বিষয় প্রচার করলে আমরা শক্তিশালী সেনাবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হব। আমি তার অজুহাত মেনে নিলাম। কারণ সে সঠিক ছিল। পরিবেশ আদৌ সহায়ক ছিলনা।

কয়েক বছর পরে কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয় দরিয়ার আমীর মুহাম্মদ বিন সউদকে আমাদের লাইনে যোগদান করাতে সক্ষম হয়। তারা আমাকে এ বিষয় জানিয়ে একটি বার্তা পাঠায় এবং দুই মুহাম্মদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং সহযোগিতা স্থাপন করার জন্য আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। মুসলমানদের হৃদয় এবং বিশ্বাস জয় করার জন্য আমরা ধর্মীয়ভাবে নাজাদের মোহাম্মদকে এবং রাজনৈতিকভাবে মোহাম্মদ বিন সউদকে ব্যবহার করি। ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য যে ধর্মীয় ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র দীর্ঘ মেয়াদী, অধিক শক্তিশালী হয়।

এভাবে আমরা ক্রমাণ্বয়ে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলাম। আমরা দরিয়া নগরীতে আমাদের রাজধানী স্থাপন করি। আমরা ওযাহাবি ধর্ম হিসেবে নতুন ধর্মের নামকরণ করি। মন্ত্রণালয় ভিতরে ভিতরে ওয়াহাবি সরকারের সমর্থন দিওত থাকে এবং তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে। নতুন ওয়াহাবি সরকার আরবী ভাষায় জানা এবং মরুভূমিতে যুদ্ধে পারদর্শী এগারজন ব্রিটিশ অফিসারকে দাসের ছদ্মবেশে নিয়োগ দান করে। আমরা এ সকল অফিসারের সাথে সহযোগিতা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। আমাদের প্রদর্শিত পথ উভয় মোহাম্মদ অনুসরণ করতে থাকে। মন্ত্রণালয় থেকে কোন নির্দেশনা না পেলে আমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতাম।

আমরা সকলে উপজাতীয় মেয়েদের বিয়ে করলাম। স্বামীর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ মুসলমান স্ত্রীদের আনন্দ আমরা উপভোগ করতাম। এভাবে উপজাতীয়দের সাথে আমাদের গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়। এখন সবকিছু ভাল ভাবেই চলছে। আমাদের কেন্দ্রীয়করণ দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছিল। কোন অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় না হলে আমরা যা তৈরি করেছি তার ফল ভোগ করতে পারব। কারণ যা করণীয় তা আমরা করেছি এবং বীজ বপন করেছি।

দ্বিতীয় অংশ

(কতিপয় নির্বাচিত প্রবন্ধ)

মুসলিম বিশ্ব পরিস্থিতি ঃ সমাধান কোন পথে?

মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা ঃ

আল্লাহতায়ালা সূরা আল ইমরানের ১১০ নম্বর আয়াতে মুসলমানদের বলেছেন যে- **"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত এবং মানব জাতীর কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব করা হয়েছে"**। কিন্তু আজকের পৃথিবীর মুসলমানদের দিকে তাকালে তাদেরকে আর শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে মনে হয় না। মুসলমানরা আজ সারা পৃথিবীতে চরমভাবে লাঞ্ছিত। ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগান, কাশ্মীর, বসনিয়া, চেচনিয়া, আলজেরিয়া, গুজরাট- এ দীর্ঘ তালিকায় কেবল মুসলমানদের নির্যাতীত হওয়ার কাহিনী। এ তালিকা যেন শেষ হবার নয় বরং নিত্য নতুন নাম যোগ হয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এর কলেবর। ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক পতনের পর থেকে উম্মাহ্'র উপর বিরামহীনভাবে চলছে প্রতিরোধহীন জুলুম, নির্যাতন, হত্যা, শোষণ ও আগ্রাসন। তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য তুলে ধরা হচ্ছে নানা রকম অজুহাত। প্রয়োজনে পাইকারী হারে নিরীহ মানুষ হত্যা করতেও তাদের বাধে না। পৃথিবীতে আজ মুসলমানদের রক্তের কোন মূল্য নেই। পশ্চিমা বিশ্ব আজ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছে যে, একমাত্র ইসলামই পারে পুঁজিবাদের মুখোশ খুলে দিতে। তাই তারা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্'র বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক সব ধরনের যুদ্ধ শুরু করেছে। ইসলাম যাতে জীবনব্যবস্থা হিসাবে মুসলিম বিশ্বে পুনঃপ্রষ্ঠিত হতে না পারে তা নিশ্চিত করাই হচ্ছে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই মুসলমানদের আকিদা থেকে বিচ্যূতি করার জন্য নেয়া হচ্ছে নানা রকম ষড়যন্ত্র। মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হয় মৌলবাদী, সন্ত্রাসী, জঙ্গী, আরো কত কি বিশেষণ দ্বারা। এভাবে মুসলমানদেরকে পৃথিবীতে কোণঠাসা করে ফেলার জন্য প্রতিনিয়ত প্রচারণা চালানো হচ্ছে। প্যালেস্টাইনের অবোধ শিশু যখন কাফের সেনাদের গায়ে পাথর ছুড়ে মারে, তখন তাকে বলা হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসী, তাকে তুলে ধরা হয় বিশ্ব শান্তির প্রতি হুমকি স্বরূপ। আর ইসরাইলী জংগী সেনারা যখন মর্টার আর বুলডোজার দিয়ে ফিলিস্তিনি জনপদ নিশ্চিহ্ন করে দেয়, তখন তারা সন্ত্রাসী হয় না, তখন তারা শান্তির প্রতি হুমকিও হয় না। মুসলমানরা আজ চরম বিভ্রান্ত এবং নেতৃত্ব হারা। তারা যাদের কাছে মার খাচ্ছে তাদের কাছেই তারা সাহায্য প্রর্থনা করে। তারা সাহায্য চায় পশ্চিমা কিছু সংস্থার যেমন- (জাতিসংঘ,সিকিউরিটি কাউন্সিল, ওআইসি) কাছে কিংবা পশ্চিমা শক্তির কাছে,

যারা তাদের নিশ্চিহ্ন করতে চায়, যারা তাদের সম্পদ লুন্ঠন করতে চায়। অনেকে মনে করে আরব মুসলিম বিশ্ব থেকে হয়তো আবার কেউ তাদের মুক্তির আহ্বান জানাবে। মূলতঃ আরব বিশ্বের নেতৃত্ব সীমাহীন বিলাসী জীবন, চরম আরাম-আয়েশ এবং গদি রক্ষার জন্য পশ্চিমা শক্তির পদলেহনে ব্যস্ত। তারা মনে করে পশ্চিমারাই তাদের গদিতে রাখতে পারে কিংবা গদি থেকে সরাতে পারে। গদি রক্ষার জন্য তারা কুফরদের যে কোন শর্ত মানতে রাজী। ইরাকে যখন মিথ্যা অজুহাতে নির্বিচারে মুসলমানদের হত্যা করা হল, তখনও গদি রক্ষার জন্য আরব নেতারা কুফরদের কাঁধে কাঁধ মিলাতে ব্যস্ত ছিল। প্যালেস্টাইনে অবোধ শিশু যখন বুলডোজারের নিচে পিষ্ট হয়, তখনও গদি রক্ষার জন্য আরব নেতারা কুফর বন্দনায় মেতে ওঠে। আমাদের আরব শাসকরা এখন পশ্চিমাদের হাতের পুতুল মাত্র। তারা ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা তো দূরের কথা– বরং এসব ভীরু ও কাপুরুষ রাজা বাদশাহ্‌রা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে আরও ত্বরান্বিত সহজ করছে। মুসলমানদের ভূমি, নৌবন্দর, বিমানবন্দর, তেল সম্পদ সবকিছু দিয়ে তারা তাদের পশ্চিমা প্রভুদেরকে মুসলমান নিধনের জন্য সাহায্য সহযোগিতা করছে। এমনকি আমাদের দেশেও দেখছি, আমরা কেমন মুসলমান তাও আমরা এসকল পশ্চিমা প্রভুদের কাছ থেকে শুনতে ভালবাসি। তারা যখন আমাদেরকে মর্ডারেট মুসলিম বলে, তখন আমাদের নেতারা খুশিতে গদগদ হয়ে ওঠে। আবার তারা যখন কালো তালিকা ভূক্তি করে তখন অনুনয় বিনয় করে বুঝাতে হয়, যে আমরা তো আসলে অতটা খাঁটি মুসলমান না, আমরাতো অনেকটা তোমাদের মতোই। প্রভুদের মন গলানোর উপরই নেতাদের ইহকাল নির্ভর করে। কিংবা উল্লেখ করা যায়, যেখানে আমাদের গ্যাস সম্পদে আগামী দশ/পনের বছর চলবে কিনা তার নিশ্চয়তা দিতে পারে না, তার পরেও এ নেতারা তা রপ্তানির করতে উদ্যত হয়ে ওঠে। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে পশ্চিমা প্রভুদের নেক নজরে থাকা। কী এক নতজানু, অপমানকর, তোষামোদী টিকে থাকার প্রণান্তকর চেষ্টা !

দুরাবস্থার কারণঃ

পৃথিবীতে আমাদের কেন এ দুরাবস্থা, তা আমরা কি কখনো একবারও ভেবে দেখেছি? আল্লাহ তায়ালা সুরা বাক্কারা'র ৮৫ নম্বর আয়াতে বলেছেন- **"তোমরা কি কিতাবের কিছু নির্দেশ মান্য কর, আর কিছু কর অমান্য। সুতরাং তোমরা যারা**

এরূপ করবে এ পৃথিবীতে তাদের জন্য রয়েছে চরম লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে তারা নিক্ষিপ্ত হবে কঠিন শাস্তির দিকে"।

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে, আমরা যদি কুরআনকে সম্পূর্নভাবে অনুসরণ না করি, তাহলে পৃথিবীতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে চরম লাঞ্ছনা এবং আখেরাতের শাস্তিতো আছেই। আজকের পৃথিবীর মুসলমাদের দিকে তাকালে দেখা যায় যে তারা কুরআনকে নিয়েছে কেবলমাত্র কয়েকটি ইবাদাত হিসেবে, যেমন- নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। কুরআনে যদি কেবল মাত্র নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এতটুকু থাকত, তাহলে তা এক প্যারার মধ্যেই সংকুলান হয়ে যেত, এত বড় বিশাল গ্রন্থ ত্রিশ প্যারার দরকার হতো না। কুরআনকে বলা হয়েছে "সম্পূর্ন জীবন-বিধান"। এর মধ্যে যেমন ইবাদাতের কথা আছে, তেমনি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন- সমাজ কিভাবে চলবে, রাষ্ট্র কিভাবে চলবে, রাষ্ট্র কোন আইন দ্বারা শাসিত হবে, বিচার ব্যবস্থা কিভাবে চলবে, শিক্ষা ব্যবস্থা কি হবে, মানুষের সাথে সমাজ এবং অন্যান্য মানুষের সম্পর্ক কিসের ভিত্তিতে তৈরি হবে, সব কিছুই আছে এ জীবন বিধানের মধ্যে। আর এ সকল বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য দরকার একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো। তাই মুসলমানরা যখন এসকল ফরযিয়াতগুলো ছেড়ে দিয়ে কেবল মাত্র কয়েকটি ইবাদাত নিয়ে মসজিদের মধ্যে ইসলামকে আবদ্ধ করে রাখবে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই অমুসলিম/কুফর শক্তি তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করবে এবং তারা চরম লাঞ্ছনার মধ্যে নির্বাপিত হবে। মূলতঃ বর্তমান বিশ্বে আজ মুসলমানদের সে অবস্থাই আমরা দেখতে পাচ্ছি। আজকে মুসলিম উম্মাহ্ কাফেরদের নির্মমতার সামনে সম্পূর্ণ অসহায়। এ শোচনীয় বাস্তবতার একটাই কারণ আর তা হচ্ছে আমরা এখন আর আল্লাহ্তা'য়ালা'র দেয়া পূর্ণাঙ্গ বিধান বা ইসলামিক রাষ্ট্র তথা খিলাফত ব্যবস্থাকে ধারণ করছি না। পৃথিবী আজ চালিত হচ্ছে মানুষের তৈরি আইন দ্বারা। মানুষের তৈরি আইন কখনো সার্বজনীন হতে পারে না। মানুষেরা যখন আইন প্রনয়ন করে তখন স্ব স্ব গোত্র বা দেশ নিজেদের স্বার্থকে সুরক্ষা করতে চায়। নিজেদের ভোগকেই নিশ্চিত করতে চায়। আজকের বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলোর বেপরোয়া হয়ে ওঠার এটাই কারণ।

সমাধান কোন পথে ঃ

তাহলে এ অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় কি? ব্যক্তিগতভাবে ইবাদত করে কি মুসলমানদের এ দুরবস্থা থেকে মুক্ত করা সম্ভব? ইরাক বা আফগানিস্তানের মাটিতে যখন অকারণে বোমা পরে তখন কেবলমাত্র মসজিদের মধ্যে মুনাজাত করে কি এ জুলুমের প্রতিরোধ করা সম্ভব? কিংবা ব্যাক্তিগত ভাবে একটি কোকাকোলা বর্জন করে এর কতটুকু প্রতিরোধ করা যায়? কিংবা প্যালেস্টাইনের মুসলমানদের বসতি যখন উজার হয়ে যায় তখন কেবলমাত্র একটি নিন্দা প্রস্তাব কি তা ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট হতে পারে? মোটেই তা কোন সমাধান নয়। তাহলে আমরা আর কতকাল অসহায় নির্বোধের মতো চুপ করে থাকব? অথচ কি নেই মুসলমানদের? দেড় শত কোটি জনগণ কি জুলুম মোকাবেলার জন্য যথেষ্ঠ নয়? মুসলমানদের কি ভূখণ্ডের অভাব? গুরুত্বপূর্ণ জনপদে বসতি রয়েছে মুসলমানদের, তাদের পায়ের নিচে রয়েছে পৃথিবীর অবারিত সম্পদ। তার পরেও কেন তাদের এ দুরবস্থা? এ সংকটময় মুহূর্তে উম্মাহ্‌র সামনে একটা প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে – কি এর সমাধান যা এ সকল আগ্রাসনের মোকাবেলা করবে? উত্তর একটাই, তা হলো এ রাষ্ট্রীয় জুলুম মোকাবেলা করার জন্য দরকার আর একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র। তাই এ জুলুম মোকাবেলার জন্য ইসলামী আকিদার ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র যন্ত্র বা খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে আজ মুসলমানদের প্রধান কাজ। যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা এ সকল জুলুমের প্রতিরোধ করবে এবং ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিবে। খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থা শুধু তার নিজের নাগরিকদেরকে জুলুম থেকে রক্ষা করে না বরং সমগ্র পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের জুলুম-নিপীড়ণবিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করে। ঈমান আনার পর একজন মুসলমানের জন্য সবচে' গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামিক রাষ্ট্র তথা খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা। এটা সকল মুসলমানের উপর ফরয। মুসলমান হিসাবে এই দায়িত্বকে অবহেলা করার মানে হচ্ছে কাফেরদের দ্বারা মুসলমানদের ধ্বংস করার যে ষড়যন্ত্র চলছে তাতে সহযোগিতা করা। খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা না করে আমরা এ সমস্যাগুলোর কোন স্থায়ী সমাধান আশা করতে পারি না। এ খিলাফত রাষ্ট্রের নেতৃত্বেই সমস্ত মুসলিম উম্মাহ্‌র জান-মাল, মান-সম্ভ্রম এবং সহায়-সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। আল্লাহ্‌তা'য়ালা সূরা নূরের ৫৫ নম্বর আয়াতে মুসলমানদেরকে এ সংগ্রামে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তিনি বলেছেন- **"তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিবে ও সৎকর্ম করিবে আল্লাহ্ তাহাদিগকে**

ওয়াদা করিতেছেন যে তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা দান করিবেন, যেমন তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে দিয়াছিলেন। "

তাই সচেতন মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে এ জুলুম নির্যাতনের পথ স্থায়ীভাবে বন্ধ করার জন্য ইসলামী জীবনাদর্শ তথা খিলাফত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করা। খিলাফত রাষ্ট্র অতীতের মতোই মুসলমানদের রক্ত, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে এবং সেই সাথে সমস্ত পৃথিবীর বিপন্ন মানবতাকে পুঁজিবাদী আগ্রাসনের কবল থেকে মুক্ত করবে ইনশাল্লাহ্। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে এ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

দৈনিক ইনকিলাব
৬ মে ২০০৪ ইং।

খিলাফত বিহীন মুসলমানদের অবস্থা

মদিনাতে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা ১৯২৪ সন পর্যন্ত সর্বশেষে তুরস্কে টিকে ছিল। পুঁজিবাদী বিশ্বের ২০০ বছরে প্রচেষ্টায় ব্রিটেনের নেতৃত্বে তাদের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে কামাল আতাতুর্কের মাধ্যমে ২৮ রজব ১৩৪২ হিজরী (৩ মার্চ ১৯২৪ সালে) মুসলমানদের খিলাফতের শেষ স্মৃতি চিহ্নটুকু মুছে ফেলতে সমর্থ হয়। সে থেকেই মুসলিম উম্মাহর সামনে ইসলামিক শরিআ বাস্তবায়নের শেষ দৃষ্টান্তটুকুও আর অবশিষ্ট থাকল না। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড কার্জন সদম্ভে ঘোষণা করেছিল, "আমরা তুরস্কের খিলাফত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছি, এটা আর কখনো পুনরুজ্জীবিত হবে না, কারণ আমরা ইসলাম ও খিলাফতের অন্তর্নিহিত শক্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছি।" খিলাফত ধ্বংসের পর মুসলিম ভূখণ্ডকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে যে সকল ছোট ছোট মুসলিম দেশগুলো আছে লিখাফতের পতনের ফলেই এগুলো সৃষ্টি হয়েছে। এখনো ইরাককে বিভক্ত করে ফেলার পায়তারা চলছে। পুঁজিবাদিরা কখনো ক্রুসেডের নামে, কখনো সাম্রাজ্যবাদী ও রাজনৈতিক শক্তি নিয়ে মুসলমানদের উপর চড়াও হয়েছে। কখনো বা অর্থনৈতিক, মানবিক সাহায্যের ছদ্মাবরণে তাদের প্রশিক্ষিত এজেন্টদের মাধ্যমে তাদের এজেণ্ডা বাস্ত বায়ন করেছে। খিলাফত ব্যবস্থা ধ্বংসের পর থেকে অনেক সময় পার হয়ে গেছে

কিন্তু মুসলমানরা তাদের টুকরো টুকরো করে ফেলা ভূমিকে আর একত্রিত করতে পারে নাই।

খিলাফতের অবর্তমানে আজও মুসলমানদের ভূমি দখল করে নেয়া হচ্ছে, তাদের সম্পদ লুণ্ঠিত করছে, তাদের সন্তানদের হত্যা করছে, চারিদিক থেকে তাদের শৃঙ্খলিত করে ফেলা হচ্ছে। দখলকৃত ভূমিতে শাসকের নামে তাদের এজেন্টদের ক্ষমতায় বসানো হচ্ছে, যা আমরা আফগানিস্তান ও ইরাকসহ অনেক মুসলিম দেশে লক্ষ্য করছি। এসকল শাসকরা ক্ষমতায় বসে কেবলমাত্র তাদের প্রভুদের উদ্দেশ্যকে হাসিল করার জন্য কাজ করছে। মুসলিম জনগোষ্ঠিকে অবমাননাকর অবস্থা, ক্ষুধা দারিদ্র ও জুলুমসহ সকল দুরবস্থার মধ্যে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। ইরাক, আফগানিস্তান, কাশ্মির, প্যালেস্টাইন, চেচনিয়া, ভলকান, গুজরাট, সুদান, উজবেকিস্তানে সর্বত্র মুসলমানদের উপর নির্বিচারে জুলুম চলছে। এখানে যাতে পুনরায় ইসলামের আলো পৌছতে না পরে, মানুষরা যাতে জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করতে না পারে তার সকল ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করে ফেলা হয়েছে। পুঁজিবাদিবিশ্ব স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের পর পৃথিবীতে এখন জীবন ব্যবস্থা হিসেবে কেবল মাত্র ইসলামেরই পুনঃর্জাগরণ হতে পারে। পুঁজিবাদিদের মনে আজ স্পষ্টই ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে তাদের ব্যবস্থা মানুষেরা বাতিল করতে শুরু করেছে। তাদের পতনের ঘন্টা বাজতে শুরু হয়ে গেছে। পৃথিবীতে ইসলাম যদি ফিরে আসে তাহলে তাদের সকল ব্যবস্থা ধ্বসে পরবে। তাদের সুদভিত্তিক ব্যবস্থা থাকবে না, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ- এর দাদাগিরি থাকবে না, মদ আর বেহায়াপনার রমরমা বানিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে, মুসলমান ভূখণ্ড থেকে সম্পদ পাচার বন্ধ হয়ে যাবে, তাই ইসলামের পুনঃর্জাগরণে তাদের এত ভয়। সে জন্য পৃথিবীর যেখানে ইসলাম ফিরে আসার সম্ভাবনা দেখা দেয়, সেখানেই পুজিঁবাদীরা বিনা অজুহাতে খড়গ হাতে হাজির হয়। আজকে মুসলমান ভূখণ্ডে অকারণে আক্রমণ তারই সাক্ষ্য বহন করে। ইরাকে যখন পারমানবিক অস্ত্রের গন্ধও খুঁজে পাওয়া যায় না তার পরেও তারা সেখানে হামলে পরে, একই সাথে উত্তর কোরিয়া যখন প্রকাশ্যে পারমাণবিক অস্ত্রের ঘোষণা দেয়, তার পরেও পুঁজিবাদীরা সেখানে ফিরেও তাকায় [illegible] কারণ উত্তর কোরিয়াতে ইসলাম কোন ইস্যু নয়। আজ মুসলিম উম্মাহকে দৃঢ়ভাবে এ সত্য অনুধাবন করতে হবে। তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে যারা নির্বিচারে অকারণে মুসলমানদের উপর জুলুম করে যাচ্ছে তাদের সাথে এক শ্রেণীর মুসলিম শাসকদের সখ্যতা আর

মাখামাখি, ক্ষমতার উচ্ছিষ্টে কামড় দিয়ে থাকার জন্য নির্লজ্জভাবে প্রভুদের পদলেহনের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। কিন্তু দীর্ঘ দিনের দুর্ভাগ্য ও দুরাবস্থার পর মুসলিম উম্মাহ যখন আজ বুঝতে পেরেছে যে কেবলমাত্র খিলাফত রাষ্ট্রই তাদের সকল দুরবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারে, আসলে তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ততক্ষণে তাদের সরকার, সেনাবাহিনী, আইন-কানুন, অর্থনীতি, সমাজ, জীবন, নিরাপত্তা, জীবনের দৃষ্টিভংগী, চিন্ত-শক্তি, কাজ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি এবং তাদের সত্তাকে ইসলাম থেকে আলাদা করার কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে।

তবুও আল্লাহ সুবাহনাহুতায়ালার অনুগ্রেহে আজ চারিদিক খিলাফতের ডাক এসেছে। মুসলমানরা বুঝতে শুরু করেছে যে এটা আল্লাহ সুবহানাহুওয়াতায়ালার নিকট থেকে তাদের ফরজ দায়িত্ব। এ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র কাঠামোই সকল জুলুম থেকে মুসলমানদের রক্ষা করতে পারে। মুসলমানরা তাই আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে এবং তাদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা ও খোলাফায়ে রাশিদীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জেগে উঠতে শুরু করেছে। এটা আর কোন কারণে নয়, এটা কেবলমাত্র আল্লাহ সুবাহনাগু ওয়াতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং মহানবী (সঃ) হাদীদ জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য। কেবলমাত্র খিলাফত রাষ্ট্রই ইসলামিক জীবন ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং তাদের চারিদিকের অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে আলোতে ফিরিয়ে আনতে পারে।

পুঁজিবাদীরা তাদের এজেন্টরা মুসলমানদের এ পুনঃর্জাগরণ সম্পর্কে অনঅবহিত নন। তারা সকল কিছুর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। তাদের কূটনীতিকগণ প্রায়ই মুসলিম বিশ্বে তাদের এজেন্টদের কাছে গমন করেছে এবং তাদের পরামর্শ ও নির্দেশনা পৌছে দিচ্ছে। আমরা বাংলাদেশেও ঘন ঘন তাদের আগমনকে প্রত্যক্ষ করেছি। তারা মুসলমানদের খিলাফতের আন্দোলনকে থামিয়ে দিতে চায়, খিলাফতের আন্দোলন থামিয়ে দেয়ার জন্য তুরস্কে ইতোমধ্যেই নতুন আইন ও শাস্তির ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। পত্র-পত্রিকায় নিবন্ধ লিখে, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম করে খিলাফত ব্যবস্থাকে আক্রমণ ও মিথ্যে সমালোচনা করে চলছে। রাজনৈতিক জীবনে ইসলামের কথা বললেই মৌলবাদী আর সন্ত্রাসী লেবেল দেয়া হচ্ছে, সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন বোমা হামলা ঘটিয়ে তা ইসলাম পন্থিদের নামে চালিয়ে দিচ্ছে। যারা ইসলামের স্বপক্ষে মানুষদের সচেতন করছে, খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে তারাই আজ কাফিরদের প্রধান টার্গেটে রয়েছে। অপরপক্ষে

এরাই সমগ্র পৃথিবীতে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য হত্যা আর লুণ্ঠন করে করে বেড়াচ্ছে এবং মুখে মানবতার বুলিসহ মজার মজার কথা বলে বেড়াচ্ছে।

সব কিছু জেনে শুনে এখন আর শোক ও কান্না নিয়ে বসে থাকা বা আবেগপ্রবণ হওয়ার সময় নয়। সময় এসেছে বুদ্ধিভিত্তিকভাবে ঘুড়ে দাঁড়াবার, শক্তি সঞ্চয়ের, উদ্দ্যম নিয়ে আগাবার। মুহাম্মদ(সঃ) ও তার সাহাবাগণ যে পদ্ধতিতে কঠোর পরিশ্রম করে আল্লাহর সহায়তায় মদিনাতে ইসলামিক খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিল। আমাদেরকেও সেই একই পন্থায় অগ্রসর হতে হবে। আজ মুসলিম উম্মাহর প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে এ জুলুম নির্যাতনের পথ স্থায়ীভাবে বন্ধ করার জন্য ইসলামী জীবনাদর্শ তথা খিলাফত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করা। এ ব্যবস্থাই মুসলমানদের জান-মালের নিরাপত্তা দিতে পারে। খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থা শুধু মুসলমানদেরই জুলুম থেকে রক্ষা করে না বরং সমগ্র পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের জুলুম-নিপীড়ণ বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করে। মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় খিলাফত ব্যবস্থা আর বেশি দুরে নয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা সূরা নুরের ৫৫ নম্বর আয়াতে মুসলমানদেরকে এ সংগ্রামে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তিনি বলেছেন- **"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে ও সৎকর্ম করবে আল্লাহ্ ওয়াদা করছেন যে তিনি তাদিগকে পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা দান করবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তীদিগকে দিয়েছিলেন।"** আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সঃ) এ ব্যাপারে আমাদেরকে আশার কথা শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন "পৃথিবীতে আবার নবুয়তের আদলে খিলাফত ব্যবস্থা ফিরে আসবে"। মহানবী(সঃ) তিরোধানের ঘটনা আমরা সকলে জানি। তার ওয়াফতের পরে কাকে খলিফা নির্বাচন করা হবে তা হয়ে উঠেছিল যুগশ্রেষ্ঠ সাহাবাদের প্রথম দায়িত্ব। প্রথমে তারা তাদের নেতা বা খলিফা নির্বাচন করেছেন তারপর তারা মহানবী (সঃ) লাশ মুবারক দাফন করেছেন। অর্থাৎ মহানবী (সঃ) লাশ মুবারক দাফন করার চেয়েও মুসলমানদের খলিফা নির্বাচন করা ছিল প্রধান দায়িত্ব। আজ মুসলিম উম্মাহ খলিফাবিহীন ৮১টি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এটা নিতান্ত কম সময় নয়। আজ দিকে দিক খিলাফতের ডাক শোনা যাচ্ছে। এ বছর হজ্জের বিশাল সমাবেশেও ইমামের কণ্ঠে খিলাফত প্রতিষ্ঠার আহ্বান ধ্বনীত হয়েছে, হজ্জ কাফেলাও তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। তারা লা ইলাহা ইল্লালাহ ধ্বনি দিয়ে ঘোষণা করেছে যে তারাও খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরিক হবেন। আমাদিগকে আজ এ দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরিক হতে হবে। সমাজের মধ্যে এ চাহিদাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। পুঁজিবাদের মুখোশ খুলে

দিয়ে তাকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করতে হবে। আর আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করতে হবে। আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে সে তৌফিক দান করুন। আমিন।

দৈনিক ইনকিলাব
১৮ মে ২০০৫ ইং।

সন্ত্রাস ও বোমা হামলা ইসলামের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র

পুঁজিবাদী শক্তির মেরুকরণঃ

সমগ্র পৃথিবী আজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এক ভাগে পুঁজিবাদী বিশ্ব, আর অন্য ভাগে মুসলমান। আমরা জানি পৃথিবীতে যত দিন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল ততদিন পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেও বিরোধপূর্ণ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। নব্বই দশকের প্রথম দিকে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন হয়। এ পাতিত ব্যবস্থা পৃথিবীতে আবার ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। ফলে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধও আপাততঃ অবসান ঘটেছে। পৃথিবীতে জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে আবার কেবলমাত্র ইসলামই ফিরে আসতে পারে এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিত্তিমূলে নাড়া দিতে পারে। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে তা পৃথিবীর অন্য সকল ব্যবস্থার উপর বিজয় অর্জন করবে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধ্বংস নামবে। পৃথিবী থেকে ওদের হাত গুটিয়ে নিতে হবে। তাই পুঁজিবাদীরা এখন ইসলামকে প্রধান প্রতিপক্ষ ভাবতে শুরু করেছে। পৃথিবীতে যাতে আবার ইসলাম ফিরে না আসতে পারে সে জন্য তারা দীর্ঘদিন ধরে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন মিডিয়াতে অপপ্রচার চালিয়ে আসছে। তারা ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। এজন্য পুঁজিবাদী বিশ্ব আজ ইসলামের বিরুদ্ধে এক মেরুতে অবস্থান নিয়েছে।

মুসলমানদের ঠেকানোর জন্য প্রেক্ষাপট তৈরি করাঃ

মুসলমানদের ঠেকানোর জন্য পুঁজিবাদীরা সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছে। মুসলমান দেশগুলোতে কৌশলে তাদের দোসরদের ক্ষমতায় বসিয়ে রাখা হয়েছে। তারা পুঁজিবাদী প্রভুদের অজ্ঞাবহ দাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তাদের স্বার্থকেই সংরক্ষণ করছে। যেখানে মুসলমানদের উত্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে কিংবা

পুঁজিবাদীদের স্বার্থে কোন রকম প্রতিবন্ধকতার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, সেখানেই মুসলমানদের উপর কৌশলে নানা প্রকার নির্যাতন নেমে আসছে। এসব করার জন্য পুঁজিবাদীদের রয়েছে নানা রকম কায়দা কৌশল। নানা রকম সন্ত্রাসী কার্যক্রম, কিংবা মিথ্যে অজুহাত দাঁড় করিয়ে তারা উদ্দেশ্য হাসিল করছে। প্রয়োজনে তারা কোন দেশের মানুষকে মৌলবাদী, সন্ত্রাসী বা জঙ্গী হিসেবে তুলে ধরছে, দেশে দেশে বোমা হামলা কিংবা কোন সন্ত্রাসী কার্যক্রম করে তা মুসলমানদের নামে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। বোমা বিস্ফোরণের সাথে সাথে তাদের এক শ্রেণীর দোসররা জিগির তোলে যে ইসলামপন্থী বা মৌলবাদীরা এ কাজ করেছে। তারপর তদন্তের নামে কিছুদিন বাহানা চলে। আর সকল দোষ নন্দ ঘোষের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। এসকল অপকৌশল অবলম্বন করে মুসলমানদের মৌলবাদী বা সন্ত্রাসী সাজানো যায়. তাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়, যে কোন অজুহাতে তাদের দেশে ঢুকে পরা যায়, তাদের দেশ দখল করে নেয়া যায়, তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করা যায়, তাদের জনগণকে নির্বিচারে নির্যাতন আর গণহত্যা করা যায়। যাদের ইশারায় এ অপকর্ম ঘটে তারা থাকে পর্দার অন্তরালে, তাদেরকে কেউ সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করার সাহস দেখায় না, তারা থাকে ধোঁয়া তুলসী পাতা। এভাবে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যক্রম মুসলমানদের নামে চালিয়ে দিয়ে তাদের ঠেকানোর জন্য প্রেক্ষাপট তৈরি করা হচ্ছে।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের সরুপঃ

বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশের দিকে তাকালে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমেরিকার টু-ইন টাওয়ারে হামলার সাথে সাথে, মুসলমানরা এ হামলা ঘটিয়েছে বলে জিগির তোলা হল। বিষয়টির কোন তদন্ত হলো না। কারা হামলা করেছে তা প্রমাণিতও হলো না কিন্তু হামলার অজুহাতে আফগানিস্তানকে দখল করে নেয়া হল।

ইরাকে জীবাণু অস্ত্র আছে বলে একসময় জিগির তোলা হল। মিথ্যে অজুহাতে দশ বছর দেশটিতে অর্থনৈতিক অবরোধ দিয়ে রাখা হলো। লক্ষ লক্ষ ইরাকী শিশু বিনা চিকিৎসায় আর শিশু খাদ্যের অভাবে জীবন দিল। বিশ্ববাসীরা পুঁজিবাদীদের ঘৃন্য আগ্রাসনকে নিরবে প্রত্যাক্ষ করলো।

পুঁজিবাদীরা ইরাকে আবার একই খেলা খেলল। এবারে প্রেক্ষাপট তৈরি করা হল গণবিধ্বংসী অস্ত্রের অজুহাত তুলে। গণবিধ্বংশী অস্ত্রতো দুরের কথা ওরা ইরাকে মশা বিধ্বংসী অস্ত্রও খুঁজে পেল না। তবুও রক্ষে নেই। মরণ কামড় দিতে পুঁজিবাদীরা সকলে মিলে ইরাকের উপর আবার ঝাঁপিয়ে পরল। দেশটাকে দখল করে নিল। নির্বিচারে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত ঝড়ালো, মা বোনরা নির্যাতিত হলো। পুঁজিবাদীদের সম্পদ লুণ্ঠনের মহাউৎসব বিশ্ব বিবেক আবারো নিরবে প্রত্যক্ষ করলো।

একইভাবে অস্থিরতা তৈরি করে ওরা নাইজেরিয়ার গ্যাস লুণ্ঠন করেছে, সুদানের তেল গ্রাস করেছে, আইভরিকোস্টের স্বর্ণ আর হিরক লুণ্ঠনে মেতে উঠেছে। ফিলিস্তিন, বসনিয়া, কাসাবো, কাশ্মির, উজবেক, গুজরাট সর্বত্র মুসলমানদের নির্যাতিত হওয়ার দীর্ঘ কাহিনী। আজ আবার ইরানের দিকেও হাত বাড়াবার পায়তারা চলছে। দেশে দেশে পুঁজিবাদীদের ষড়যন্ত্রে মুসলমানরা জীবন দিচ্ছে, ওদের বোমার আঘাতে মুসলমান ভূখণ্ড তামা হচ্ছে, বুলডোজারের নিচে ফিলিস্তিনি শিশুর রক্ত ঝরছে, নির্যাতনের ফলে গুয়েন্তানামো বে কিংবা আবু গারীবের বন্দীশালাগুলোতে গগনবিদারী আর্তনাদ ওঠছে, তখনও ওদরকে কেউ মানবতা লঙ্ঘনকারী কিংবা সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করছেনা। এ হচ্ছে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের উপর পুঁজিবাদীদের আগ্রসনের সরূপ এবং তার গুটিকয়েক উদাহরণ মাত্র।

এবারে বাংলাদেশঃ

এবারে বাংলাদেশকে নিয়ে তারা একই খেলায় মেতে উঠেছে। প্রেক্ষাপট তৈরির কৌশল কিছুটা আলাদা। গত ১৭ আগস্ট এদেশের ৬৩টি জেলায় পাঁচ শতাধিক বোমা ফাটিয়ে প্রেক্ষাপট তৈরির এক মহড়া করল। দেশটায় নাকি মৌলবাদী আর জঙ্গীতে ভরে গেছে বলে ওদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। যে দেশের জরায়ুতে তেল, গ্যাস আর কয়লার মতো জ্বালানি থাকে, আর বুকের উপর থাকে মুসলমান, সে দেশকে কব্জা করতে কিছুটা কৌশলতো নিতেই হবে। পুঁজিবাদের আদর্শিক প্রতিপক্ষ মুসলমান আর সে দেশের উদরে যদি থাকে কোন সম্পদ, তাহলে বাংলাদেশ, কি করে ভাব-তুমি এত সহজে পেয়ে যাবে পার। প্রয়োজনে তোমায় সাজাতে হবে সন্ত্রাসী কিংবা মৌলবাদী। প্রয়োজন হলে আরো প্রশিক্ষিত জমাতুল মুজাহিদীন নামক জমাতুল জঙ্গীদের বিচরণ ক্ষেত্র বানাতে হবে তোমার বুকে।

তারপর লুণ্ঠন করার জন্য ফ্যাসাদকারীরা আসবে, বলবে "আমরাতো শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী"। এদেশে আজ **শান্তি প্রতিষ্ঠাকারীর** নামক লুণ্ঠনকারী **আগমন অনিবার্য করে তুলেছে**। ওদের এদেশে আগমনের প্রয়োজনীয় দাসখত সম্পন্ন হয়েছে অনেক আগেই। তাই কোন ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই ওদের আনাগোনায় কূটনৈতিক পাড়া মুখরিত হয়ে ওঠে। বোমা ফুটানোর সাথে সাথেই ওদের দোসররা শেখানো বুলি আওরাতে থাকে। পার্শ্ববর্তী একটি দেশের রাষ্ট্রদুতের বলতে মোটেও সময় লাগেনি যে, যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারাই নাকি এ কাজ করেছে। তাদের দেশ থেকে আমাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপেরও দাবি তুলেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বোমা হামলা থেকে প্রকৃত ফায়দা লোটার জন্য ওরা তৈরি ছিল আগেই। ওরাই হচ্ছে আসল ক্রিয়ানক। ওদের কব্জায় এদেশকে বন্দী রাখতে চায় অনেক আগে থেকেই। ওদের ঈংগিতে আমাদের বৃহত্তর পাটকল বন্ধ হয়, পাট ব্যবসা হাতছাড়া হয় আর সরকার এটাকে তাদের সাফল্য বলে চালিয়ে দেয়। আমাদের স্টিল মিল বন্ধ হয়, ওরা বিনিয়োগের মোহ দেখায়, আর সরকার হাততালী নেয়। ওদের ইসারায় আমাদের গ্যাস ক্ষেত্রে আগুন লাগে, সহস্র কোটি টাকার সম্পদ পুড়ে আর সরকার নিরব দর্শক সেজে তা প্রত্যক্ষ করে। ওদের চক্রান্তে আমাদের নদীগুলো পানি শূন্য হয়, নদীমাতৃক দেশটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মরুকরণের পথে আগায় আর সরকার গদী হারানোর ভয়ে কথা বলে না। দেশ জুড়ে অর্ধ সহস্র বোমা ফোটে, কাদের সুবিস্তৃত নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত হয়, কোটি কোটি টাকার যোগান কারা দেয়, সরকার সে দিকে ইংগিত করে না কারণ ভাণ্ডরের নাম মুখে আনলে যদি থলের বিড়াল বের হয়ে যায়। থলের বিড়াল চিহ্নিত করার জন্য তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের কলমেও কালি বের হয় না, মিডিয়ার পাতায় লাল হেডিংও হয় না। তাই এ দায়িত্ব আজ আম জনতার নিতে হবে। বোমা হমলার অন্ত রালে কোন ছদ্মবেশি লুকিয়ে আছে. কোন দেশের সাথে সংশিষ্টতা আছে, তার উৎস খুঁজে বের করতে হবে এবং দেশী-বিদেশী চক্রান্তকারীদের মুখোশ খুলে দিতে হবে। বন্ধ করতে হবে দেশ ও ইসলামের বিরুদ্ধে আগ্রাসন আর মুসলমানদের অকারণ হয়রানি করার অপকৌশল।

বোমা হামলা দ্বারা কারা সুবিধা নিচ্ছেঃ

এদেশের সচেতন জনগণকে বিষয়টি একটু গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে যে "এ সকল বোমা হামলা দ্বারা সুবিধা নিচ্ছে কারা?", হামলার সাথে সাথে কারা এর ফায়দা ঘরে তোলার জন্য উঠে পরে লেগেছে? এর সাথে তাদের সংশ্লিষ্টতাই প্রমাণ

করে। যারা পৃথিবীতে ইসলামী ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে চায়, তারা ভাল করেই জানে যে বোমা হামলা দ্বারা মানুষকে ইসলামে ফিরিয়ে আনা যায় না বরং মানুষ ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়, ইসলামের নামে ভীতি তৈরি হয়। তাহলে যে কার্যক্রমের ফলে মানুষ ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়, ইসলামের প্রতি বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়, কোন ইসলামী দলের পক্ষে সেরকম কোন কার্যক্রম পরিচালনার প্রশ্নই উঠে না। নিজের নাক কেটে নিজের যাত্রা ভংগ কোন পাগলেও করে না। অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একের পর বোমা ফাঁটানো হচ্ছে, কৌশলে তদন্তগুলো আড়াল করা হচ্ছে, পত্র-পত্রিকায় মৌলবাদীর জিগির তোলা হচ্ছে, আর এর হোতারা দূরে বসে কলকাঠি নাড়ছে। এটা আসলে মুসলমানদের ইসলাম থেকে দুরে সরানো, ইসলামী আন্দোলন বিমুখ করা এবং ইসলামকে ধ্বংস করার একটা অপকৌশল। এ বোমা হামলা থেকে ইসলামের শত্রুরাই সুবিধা নিচ্ছে। তাই নিঃসন্দেহে এটা তাদেরই কাজ।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার নিজস্ব পদ্ধতিঃ

পৃথিবীতে ইসলাম এসেছে সমাজ পরিবর্তন করে মানুষকে মুক্তি দিতে। কোন সন্ত্রাসী কার্যক্রম দ্বারা তা সম্ভব নয়। ইসলাম প্রতিষ্ঠার নিজস্ব পদ্ধতি আছে। সত্যিকার ইসলামী দলগুলোও সেভাবেই কাজ করে। সহিংসতা, পেশীশক্তি কিংবা সশস্ত্র সংগ্রাম কখনোই সমাজ পরিবর্তন করা যায় না। উপরোক্ত এগুলো মানুষের মনে ভয়ভীতি ও বিরোধের জন্ম দেয়। যা সমাজকে ইসলাম থেকে আরো দূরে সরিয়ে রাখে। মানুষের চিন্তা পরিবর্তনের একমাত্র পথ হচ্ছে তাদের মধ্যে বিদ্যমান ভ্রান্তিগুলোকে তুলে ধরা এবং যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে সঠিক চিন্তাগুলোকে বুঝিয়ে দেয়া। ইসলামে চিন্তা পরিবর্তনের এটাই হচ্ছে একমাত্র পদ্ধতি। আল্লাহতায়ালা বলেছেন "আপনি আহ্বান করুন মানুষকে আপনার রবের পথের দিকে হিকমত ও উত্তম উপদেশ দিয়ে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়" [-সূরা নাহল ১২৫]। মহানবী (সাঃ) এর জীবনীতেও আমরা দেখতে পাই যে তিনি কখনোই ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সহিংসতার পথ গ্রহন করেন নি। তিনি (সাঃ), তার সাহাবী ও অনুসারীগণ সকলেই যখন নানা হয়রানি, নির্যাতন ও নীপিড়নের স্বীকার হয়েছেন তখনও একটি বারের জন্যও সহিংসতার পথ অবলম্বন করেননি। সাহাবীহগণের উপর নীপিড়ণের মাত্রা অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেছে তখনও মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন *"মূলতঃ আমি ক্ষমার জন্য আদিষ্ট সতরাং পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয়ো না।"* ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুহাম্মদ(সাঃ)-এর অনুসৃত পদ্ধতিগুলো হচ্ছে সমাজের

ভ্রান্ত বিশ্বাসের সরুপ উন্মোচন করা, অর্থনীতিতে দূর্নীতিগুলো তুলে ধরা, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের বর্বরতাগুলোকে তুলে ধরা এবং নীপিড়নকারী শাসকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং সে সাথে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর ইসলামী সমাধান জণগণের মাঝে তুলে ধরতে হবে। যাতে করে জনগণ ইসলামী ব্যবস্থার উপর আস্থাশীল হয়ে উঠে। এভাবে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান চাহিদা তৈরি করে তা জন দাবিতে পরিণত করতে হবে। জনগণ যখন সোচ্চার হবে তখন স্বাভাবিক ভাবেই দুর্নীতিগ্রস্থ মানব রচিত ব্যবস্থার ধ্বস নামবে এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। এভাবে রাসূলুল্লাহ(সাঃ) দাওয়াত ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার আওতায় সেনাবাহিনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিধান করেছেন এবং পৃথিবী থেকে জুলুম উৎখাতের জন্য অসংখ্য জেহাদ পরিচালনা করেছেন। সমাজে ও রাষ্ট্রে ইসলাম না থাকার কারণেই আজ অপরাধ ও দুর্নীতি বিস্তার লাভ করছে। আল্লাহতায়ালা সকল মুসলমানদের জন্য বাতিল ব্যবস্থার পরিবর্তন করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করাকে ফরয করেছেন এবং এ সংগ্রামে রাসূলুল্লাহর(সাঃ) পদ্ধতি অনুসরণ করাকে বাধ্যবাদকতা করেছেন। তিনি বলেছেন ***"আর আপনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করুন আল্লাহতায়ালা যা নাজিল করেছেন তদঅনুযায়ী এবং তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবেন না"*** [সুরা মায়েদা: ৪৯] **তাই মুসলমানদেরকে আজ সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে খিলাফত প্রতিষ্ঠার শান্তিপূর্ণ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে হবে।**

দৈনিক ইনকিলাব
৯, ১০ ১১ ডিসেম্বর ২০০৫ ইং।

রক্তস্নাত উজবেকিস্তান ঃ ইসলাম যেখানে বিপন্ন

উজবেকিস্তান পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য এলাকারসমূহের একটি। দেশটিতে স্বৈরশাসক একটি রক্তক্ষয়ী অধ্যায় অতিক্রম করেছে। সম্প্রতিকালে উজবেকিস্তানে বিশ্ববিবেক ও মিডিয়ার অন্তরালে একটি গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। আমরা দেশটির অভ্যুদ্বয় এবং এবং ঘটনা প্রবাহ নিয়ে আলোচনা করব।

প্রাচীন ইতিহাসঃ

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম মিলিনিয়ামে কোন এক সময় ইরানের নরম্যাড (normads) সম্প্রদায়ের লোকেরা উজবেকিস্তানে আগমন করে। তারা নদী তীরবর্তী অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং চাষাবাদ শুরু করে। এ সময় চীনারা ইরানের সাথে সিল্ক ব্যবসা শুরু করলে বুখারা ও সমরকন্দ ব্যবসায়ের রুট হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং উন্নতি ছোঁয়া লাগতে থাকে। তখন এ অঞ্চল পারস্য সম্রাজ্যের আওতাভুক্ত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ সালে আলেকজাণ্ডার এ অঞ্চল অধিকার করে এবং তা মেসিডোনিয়ান সরকারের আওতায় চলে আসে। এ শতকে এ অঞ্চল জ্ঞানে কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগঃ

আরবরা ৮০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে এ অঞ্চল জয় করে এবং ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। তখন থেকে ইসলামিক জীবন-ব্যবস্থা এবং কালচার প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। দশম খ্রিস্টাব্দের দিকে সরকারি ও ব্যবসা বাণিজ্যের ভাষা হিসেবে আরবী ব্যবহৃত হতে শুরু হয়। আব্বাসীয় খিলাফতের ৮০০ থেকে ৯০০ খ্রিস্টাব্দ সময় পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার দেশগুলোকে স্বর্ণ যুগের সূচনা হয়। বুখারা মুসমলিম শিক্ষা ও কৃষ্টি কালচারের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। বুখারাকে তখন তৎকালনি সময়ের কায়রো, বাগদাদ বা করদোবার সাথে তুলনা করা যেত। এখানে অনেক মুসলিম ইতিহাসবিদ, বিজ্ঞনী, ভূগোলবিদ জন্ম হয়েছে। আব্বাসীয় খিলাফত দুর্বল হতে থাকলে স্থানীয় ইসলামিক দেশগুলোর প্রভাব এ অঞ্চলে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন থেকে এখানে পার্শিয়ান ভাষার ব্যবহার শুরু হয়।

মঙ্গলীয় শাসনঃ

মঙ্গলীয়রা ১২১৯ থেকে ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিস খানের সেনাবাহিনীর সহায়তায় মধ্য এশিয়া দখল করে। চেঙ্গিস খানের সেনাবাহিনীতে যে সকল তুর্কী গোত্রীয় সদস্য ছিল তারা মাওয়ারানাহ (Mowarannah) এ ঘাটি স্থাপন করে এবং স্থানীয় জনসাধারণের সাথে মিশে যায় এবং এর ফলে নতুন একটি জেনারেশন তৈরি হতে থাকে। এর ফলে ইরানীয়রা আস্তে আস্তে সংখ্যা লঘুতে পরিণত হতে থাকে।

তৈমুরের শাসনঃ

১২২৭ সালে চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর তার তিন ছেলের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে যায়। এ সময় বিভিন্ন গোত্র প্রধানদের উত্থান ঘটে। ১৩৮০ খ্রিস্টাব্দে তৈমুর

একজন গোত্র প্রধান হিসেবে মাওয়ারানাহ দখল করে নেয়। তৈমুর ক্রমান্বয়ে শক্তি সঞ্চয় করে এবং পশ্চিম এশিয়া, ইরান, এশিয়া মাইনর এবং এরাল সাগরের দক্ষিণ এলাকা দখল করে নেয়। তৈমুর বিজ্ঞানী ও শিল্পিদের খুব সমাদর করতেন। এ সময় পার্শী ভাষার ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তৈমুরের মৃত্যুর পর তার সম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পরে এবং তার শাসন আমলের অবসান ঘটে।

উজবেক শাসনকালঃ

১৫০০ খ্রিস্টাব্দে উজবেকেরা বর্তমান উজবেকিস্তানসহ মধ্য এশিয়া দখল করে। বুখারাতে তারা একটি রাষ্ট্র গঠন করে। এখান থেকে তারা তাসখন্দ ও উত্তর আফগানিস্তান নিয়ন্ত্রণ করতো। তারা খোরাজমে দ্বিতীয় রাষ্ট্র গঠন করে। নিজেদের মধ্যে এবং পার্শীয়ানদের সাথে প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে বুখারা ও খোরাজম রাষ্ট্র দুটি ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময় বেশ দুর্বল হয়ে পরে। উজবেক রাষ্ট্র দুর্বল হওয়ার আর একটি কারণ হলো তখন ইউরোপ ও চীনের মধ্যে ভারত হয়ে জল পথে নতুন বানিজ্যের রুট চালু হয়। জল পথে বিভিন্ন শহর ও বন্দরে নতুন ব্যবসায়িক কেন্দ্র গড়ে ওঠার ফলে বুখারা, সার্ভ, সমরখন্দ এ সকল ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলো ধ্বংস হয়ে যেতে থাকে।

রাশিয়ানদের আগমনঃ

এ সময় মধ্য এশিয়াতে রাশিয়ানদের আগমন ঘটে। রাশিয়ান ব্যবসায়ীরা এ অঞ্চলে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে থাকে। তারা তাসখন্দ এবং খিভার বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে। মধ্য এশিয়াতে ক্রীতদাসের ব্যাপক চাহিদা থাকায় স্থানীয় লোকেরা সীমান্ত এলাকা থেকে রাশিয়ানদের অপহরণ করে এবং কাস্পিয়ান সাগর থেকে জেলেদের ধরে এনে বুখারা ও খিভায় দাস হিসেবে বিক্রি করতো। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে এ সকল ঘটনা রাশিয়ান এবং মধ্য এশিয়ার লোকদের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত ঘটায়। বিরোধের জের হিসেবে রাশিয়ানরা ১৮৫০ সালে ককাশাস অধিকার করে নেয় এবং পরে তারা ১৮৬৫ সালে তাশখন্দ, ১৮৬৭ সালে বুখারা এবং ১৮৬৮ সালে সমরখন্দ অধিকার করে। ১৮৭৬ সালে রাশিয়ানদের শাসন কতৃত্বে বর্তমান উবেকিস্তান গঠিত হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়াতে শিল্প কারখানার বিকাশ ঘটে। তাদের শিল্প কারখানা বিশেষ করে টেক্সটাইল শিল্পের তুলা সংগ্রহের জন্য এ অঞ্চলকে ব্যবহার করে। বিংশ শতাব্দিতে ও রাশিয়ানরা এ অঞ্চলকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করে। তারা উজবেকিস্ত

ানকে বুখারা, ক্ষিভা এবং তাসখন্দ এ তিনটি অঞ্চলে ভাগে করে। ১৯২৪ সালে উজবেক সোভিয়েত রিপাবলিক গঠিত হয়।

উজবেক স্বাধীনতা

১৯৯১ সনে রাশিয়াতে কমিউজমের পতনের পরে গণআন্দোলন এবং একটি রেফারেণ্ডামের মাধ্যমে উজবেকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে এবং তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী ইসলাম করিমভ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়।

করিমভের শাসনকালঃ

কমিউনিজমের জঞ্জাল অপসারণ করার পরে সাধারণ মানুষ ইসলামকে আকড়ে ধরে মুক্তির পথ খুঁজতে থাকে। কিন্তু কমিউনিজম দিয়ে ধোলাই করা করিমভের মগজে তা ভাল না লাগাই স্বাভাবিক। করিমভ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের উপর চড়াও হয় এবং অনেক ইসলামেক নেতা কর্মীদের জেলে আবদ্ধ করতে থাকে। সে ইসলামিক পুণঃজাগরণের আন্দোলনকেও দমিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাসখন্দ সরকারী অফিসের সামনে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে কয়েকজন লোক প্রাণ হারায়। কিন্তু সাক্ষ্য প্রমান ছাড়াই "যত দোষ নন্দ ঘোসের" কাধে চাপানো হয়। পরের বছর উজবেকিস্তানে আমেরিকাকে এয়ারবেজ স্থাপন করতে দিয়ে আর করিমভ আর এক সম্রাজ্যবাদের কৃপাদৃষ্টি লাভে সমর্থ হয়। ইসলামী পুনর্জাগরণের ভয়ে সরকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং সকরকারী ইমাম নিয়োগ করে। তারা সরকারের পছন্দমতো ধর্ম পরিচালানা করে। সচেতন জনগণ এ ব্যবস্থাকে "সরকারী ইসলাম" হিসেবে আখ্যায়িত করে। সরকার কোন কোন মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। সরকারী ব্যবস্থার বাইরে ইসলাম প্রিয় জনগণ নিজেদের উদ্যোগে মসজিদ প্রতিষ্ঠা এবং ধর্মীয় আচার অনুশীলন করতে থাকে। এটা "বেসরকারী ইসলাম" হিসেবে প্রচারণা যায়। এ বেসরকারী ইসলাম পালনকারী মুসলমানরা সরকারের রোষানলে পরে এবং সরকার তাদের মৌলবাদী, সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করতে শুরু করে। সরকার বিভিন্ন ছলছুতায় তাদের কারাগারে আবদ্ধ করতে থাকে এবং তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালয়। স্বৈরচারের বিরুদ্ধে যে কোন ক্ষোভের জন্য এদের দায়ী করা হয়। দেশে সংঘটিত যে কোন সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কাজের জন্য ও এদের দায়ী করে স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য অমানুষিক নির্যাতন চালাতে থাকে। কাউকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়, কাউকে গরম পানিতে সিদ্ধ করে মারা হয়, কারো

মা বোনদের তুলে এনে চোখের সামনে ধর্ষণ করা হয়, এসকলই হচ্ছে স্বীকারোক্তি আদায়ের অপকৌসল। স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেলে তা জনসমক্ষে প্রচার করে তাদের সন্ত্রাসী হিসেবে ফাঁসি দেয়া হয় আর আর স্বীকারোক্তি না দিলে নির্যাতন করতে করতে মেরে ফেলা হয়। এ ধরনের পাশবিক নির্যাতনের ফলে ১৯৯৯ সালে বিভিন্ন কারাগারে ৩৮ জন বন্দীর মৃত্যু ঘটে। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের জন্ম হয়। কারিমভ সরকারের পদত্যাগের দাবীতে ১৯৯৯ সালে লিফলেট বিতরণ করার অভিযোগে ২৫ জন ছেলে কে গ্রেফতার করা হয়। এ সকল ছেলেদের বয়স ছিল মাত্র নয় থেকে বার বছর। উজবেক সরকারের কারাগারে হাজার হাজার ধর্মপ্রান মানুষ বন্দী জীবন যাপন করতে থাকে। এ বছরই সাধারণ ধর্মপ্রান মানুষেরা মসজিদসহ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দেয়া এবং নিরপরাধ বন্দীকে মুক্তি দেয়ার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানাতে থাকে। এতে কারিমভ সরকার আরো দমন পিড়নের নীতি গ্রহণ করে।
১৯৯৯ সালে নাসিরুদ্দিনভ বাহরাম, হিযবুত তাহরীর নামক একটি ইসলামী দলের একটি লিফলেট ন্যাশনাল সিকিউরিটি সার্ভিসের কাছে ইমেইল করে পাঠানোর অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পরে তাকে অমানুষিক ভাবে পিটানো হয়। এমন কি তার আইনজীবীর সাথে সাক্ষাত করার আগে তাকে হাতুরী দিয়ে পিটিয়ে তার শরীর থেতলে দেয়া হয়। পরিশেষে তাকে ১৬ বছরের জেল দেয়া হয়।

১৭ জানুয়ারি ২০০০ মুজাফ্ফর আভাজভ নামক হিযবুত তাহরীরের আর এক কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। অমানুষিক নির্যাতন করে তার দাত তুলে ফেলা হয়, আঙ্গুল থেকে নখ তুলে ফেলা হয়, তার শরীরের বিভিন্ন অংশ ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলা হয়, অবশেষে তাকে গরম পানিতে চুবিয়ে ২০০২ সনে হত্যা করা হয়। তার ৬২ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা মা ছেলে হত্যার বিচার চাইতে গেলে তিনিও স্বৈরশাসকের রোষানলে পরেন অবশেষে স্বৈরশাসক তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, "তিনি খিলাফত বা ইসলামীক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার লক্ষ্যে অণ্ডারগ্রাউণ্ডে মহিলাদের সংগঠিত করছেন"। এ অভিযোগে তাকে ও ছয় বৎসরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। মুজাফ্ফর আভাজভের ছোট ভাইকে গ্রেফতার করা হয় ২০০০ সনের জুন মাসে। জামাতে নামায আদায় করার অপরাধে তাকে এমন ভাবে টর্চার করা হয় যে তাতে তার মৃত্যু হয়।

২০০৩ সালের ১১ মে অনেক কর্মচারী জেলখানায় অনশন ধর্মঘট করে। অন্যান্য দাবির মধ্যে তাদের একটি দাবি ছিল যে তাদের প্রার্থনা করতে দিতে হবে। তাদের প্রার্থনা করার দাবি মেনে নেয়া হয় কিন্তু পরের দিন সকালে তারা নামায আদায় করলে তাদের অন্ধকার নির্জন সেলে পাঠানো হলো। একজন বন্দীর বোন বলেন জেলখানায় জামাতে নামায আদায় করার অপরাধে তার ভাইকে লোহার রড দিয়ে পেটানো হয়েছে।

২০০৪ সালে জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়া হিযবুত তাহরীরের একজন কর্মী বলেন তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং কার্যক্রম ছেড়ে দেয়ার জন্য বলা হয় এবং তাদের লাঠি দিয়ে অমানুষিক ভাবে পিটানো হয়। মহিলাদের জেলখানার কর্মচারীদের দ্বারা ধর্ষণ করানো হয়।

একজন মহিলা চিৎকার করে বলছিল যে চার বছর আগে আমার ছেলেকে ওরা জেলে আবদ্ধ করেছে। যখন তিনি সর্বশেষ সাক্ষাত করেছেন তখন তার ছেলের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। নির্যাতনে তার সমস্ত শরীর নীল এবং কালো বর্ণ হয়ে ছিল। বিশ জন কারারক্ষীরা তাকে নির্দয়ভাবে পিটিয়েছে। এরপর আর তিনি ছেলের সাক্ষাৎ পায় নি। কোয়ারসী কলোনীর ২২ জন বন্দী বলেন জেলখানা থেকে মুক্তি দেয়ার সময় তাদের অনেকের শরীরে সিরিঞ্জ দিয়ে AIDS ভাইরাস ঢুকিয়ে দেয়া হয়।
এ সকলতো অত্যাচারের কেবল কিছু খণ্ডিত চিত্র মাত্র। আসল চিত্র আরো বিভৎস।

সম্প্রতীক ঘটনাঃ

সরকারের ভয় হচ্ছে মানুষরা ক্রমাগত ইসলামের ছায়াতলে একত্রিত হয় খিলাফত ব্যবস্থার পক্ষে সোচ্চার হচ্ছে। তাদেরকে কঠোরভাবে দমন করতে না পারলে তার ক্ষমতার মসনদ টিকে থাকবে না। এ জন্য প্রয়োজন হলে সকল আন্দোলনকারীদের তিনি হত্যা করতে পিছ পা হবেন না। কারণ কমিউনিস্টদের এ উত্তরসূরীরা ইসলামের অগ্রযাত্রাকে সহ্য করতে পরেনা। সরকারী হত্যা যজ্ঞে দেশীয় সেনাবাহিনী নিস্পৃহতা দেখাতে পারে তাই এ কাজে সহায়তা করার জন্য তার পরামর্শদাতা রাশিয়া সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এর জন্য রাশিয়া ৫০০০ সৈন্য সরবরাহ করে। এরপর মে'০৫ মাসের প্রথম দিকে তাদের পরিকল্পনামাফিক সরকারী গোয়েন্দা সংস্থাকে মাঠে নামানো হয়। তারা জনগণের সাথে মিশে

এমনভাব দেখায় যেন তারা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে প্রস্তুত। যাদের সরকার অকারণে জেলে আবদ্ধ করে রেখেছে তাদের মুক্ত করে আনবে, সরকারকে ভাল সার্ভিস পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ করতে বাধ্য করবে। এ লক্ষ্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আত্মগোপন করে থাকা ইসলামী নেতাদের খুঁজে বের করা, মাঠে নামানো এবং পরিশেষে গ্রেফতার ও হত্যা করা। তারা মানুষদের উদ্বুদ্ধ করে ১২ ও ১৩ মে'র মধ্যে আন্দিজান শহরের কেন্দ্রস্থলে প্রায় ৫০,০০০ লোকের সমাগম ঘটাতে সক্ষম হয়। এর মধ্যে ছদ্মাবরণে সরকারের আর্মস গ্রুপকেও তৈরি করে রাখা হয়। তারা জেলখানা অভিমুখে মার্চ করে কিছু বন্দীদের মুক্ত করে ফেলে এবং সরকারী আর্মস গ্রুপ ও আন্দিজানে ইতোমধ্যেই তৈরি করে রাখা ৫০০০ রাশিয়ান সৈন্যকে ফায়ার করার নির্দেশ দেয়া ছিল। তারা ছেলে বৃদ্ধ শিশুদের নির্বিচারে গুলি করতে থকে। শুক্রবার বিকেল থেকে শনিবার পর্যন্ত আন্দিজান শহরে এ গণহত্যায় প্রায় ৭০০০ নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারায়। এ হত্যাকাণ্ড যাতে প্রকাশ না পায় সে জন্য ঘাতকরা আন্দিজানে কোন সাংবাদিক প্রবেশ করতে দেয়নি। পরের দিন হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে প্রেস কনফারেন্সে জঘন্য মিথ্যাচার করা হয়। অন্যান্য কারাগার থেকেও হত্যাকাণ্ডের খবর আসতে থাকে। অনেকের ধারণা সকল জেলখানায় এ হত্যাকাণ্ড ২০,০০০ ছাড়িয়ে যেতে পারে। আন্দিজান শহর আর জেলখানাগুলো সেদিন মুসলমানদের পবিত্র রক্তে স্নাত হয়ে ওঠে।

পরিশেষেঃ

পৃথিবীতে যাতে খিলাফত ব্যবস্থা ফিরে না আসতে পারে সেজন্য কাফেরদের দোসররা পরিকল্পিতভাবে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র আজ করিমভ আর হামিদ কারজাইয়ের মতো কাফেরদের দোসররা রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে আছে। খিলাফত ব্যবস্থার আগমনে ওদের অনেক ভয়। কারণ তাহলে ওরা আর ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না। কাফেরদের পদলোহন করে ক্ষমতায় থাকাই ওদের জীবনের মূল লক্ষ্য। পৃথিবীতে ইসলাম ফিরে আসার পথে এরাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাঁধা। এ বাঁধা অপসারণ করার লক্ষ্যে কাজ করাই আজ প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। মুসলমানরা খিলাফতের আওতায় একত্রিত হতে পারলে কুফরদের ব্যবস্থা ধ্বসে পরবে। ওরা খিলাফতের আগমনে যতই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করুক না কেন, বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে আজ খিলাফতের ডাক এসেছে। সকলকে এ কাফেলায় সামীল হতে হবে। খিলাফতের আগমনেই

মুসলমানদের উপর সকল জুলুম আর নির্যাতনের অবসান হবে। শুধু আন্দিজান বা উজবেক নয়, ইরাক, কাশ্মির, গুজরাট, ফিলিস্তিন, আফগান সকল নির্যাতীত জনপথ থেকে কেবল অভিন্ন খিলাফত ব্যবস্থাই মুসলমানদেরকে কাফেরদের আগ্রাসন থেকে হেফাজত করতে পারে। তাই এ কাফেলায় শামিল হয়ে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা আজ মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহতায়ালা তার ইচ্ছায় তার দ্বীনকে বিজয়ী করবেনই। তিনি এ বিজয়ের জন্য মুমিনদের কাছে ওয়াদা দিয়েছেন। প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদেরকেও এ ব্যপারে আশার কথা শুনিয়ে গেছেন। এখন মুসলসানদেরকে এ ঈমানী দায়িত্ব পালন করার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। আমিন।

দৈনিক ইনকিলাব
১৩, ১৪ ১৫ জুলাই ২০০৫ ইং।

১১২২ হিজরী মোতাবেক ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে কমনওয়েলথ মন্ত্রী আমাকে একজন গোয়েন্দা হিসাবে মিসর, ইরাক, হেজাজ এবং ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে উপদল সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা। মন্ত্রণালয় সাহস ও উদ্যমের জন্য একই মিশনে এবং একই সময়ে কাজ করার জন্য আরও নয় জনকে নিয়োগ দেয়। আমাদেরকে প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা, তথ্য এবং ম্যাপ এবং রাষ্ট্র প্রধান, বুদ্ধিজীবি ও গোত্র প্রধানদের নামের একটি তালিকা দেয়া হল। সচিবকে বিদায় জানানোর সময়কার একটি কথা আমি কখনও ভুলবনা। তিনি বললেন "আপনাদের সফলতার উপর আমাদের রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সুতরাং আপনারা আপনাদের সর্ব শক্তি প্রয়োগ করবেন"।

জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা।